Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন, সুদ ও আধুনিক বিজ্ঞান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নূরদিদা বিনতে সালাম

রোলঃ ২১৫০০৫০২

৫ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন, সুদ ও আধুনিক বিজ্ঞান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নূরদিদা বিনতে সালাম

রোলঃ ২১৫০০৫০২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন, সুদ ও আধুনিক বিজ্ঞান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নূরদিদা বিনতে সালাম, আইডিঃ ২১৫০০৫০২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন, সুদ ও আধুনিক বিজ্ঞান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



তারিখঃ

৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

(স্বাক্ষর)

নূরদিদা বিনতে সালাম

আইডিঃ ২১৫০০৫০২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১.ভূমিকা	৬
২.রিবা/সুদ কি?	৮
৩.সুদের শাব্দিক বিশ্লেষণ	৮
৪.'রিবা' শব্দ ও অন্যান্য শব্দের মাঝে তুলনা	১১
৫.কুরআন কারীমে 'রিবা' শব্দের ব্যবহার	১২
৬.রিবা বিষয়ে কেন জানতে হবে?	১২
৭.রিবার ভয়ানহতা:কুরআনুল কারীম, সহীহ হাদীসো আছার থেকে	১৪
৮.সুদখোরের সাথে কোন সমঝোতা নেই	১৮
৯.রিবা: পরকালে অকল্পনীয় ভয়াবহ শাস্তি	২১
১০.রিবার বিরুদ্ধে নবীজীর পাহাড়সম দৃঢ়তা ও ঐতিহাসিক ঘোষণা	২১
১১.সমাজে রিবা ছড়িয়ে পড়া কেয়ামতের আলামত	২৩
১২.রিবা অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার	২৬
১৩. ইসলামী অর্থনীতিকে সুদ:পরিচিতি ও তাৎপর্য	২৯
১৪.সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল ও সুফল	৩৭
১৫.সাধারণ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর	৩৮
১৬.দাওয়াহ দেয়ার পদ্ধতি	৭৭
*সুদ ও সুদমুক্ত অর্থনীতি	৮৩
*কোরয়ান সিলেবাস,মেয়েদের পর্দা, নারী সাক্ষী অর্ধেক কেনো? উত্তারিধিকারে নারী অর্ধেক কেনো, মুসলমানদের একমুখী দেখা যায় কেনো? ইসলামে এত ফিরকা বা দল কেনো?	৮৫
*বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে?	৯২ .

*কুরআন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ নাকি অসঙ্গতিপূর্ণ?	৯৩
*কিয়ামত কি আসবে? বিজ্ঞান কী বলে	৯৩
*সবকিছুর ই একজন সৃষ্টা আছেন,তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?	৯৪
*মুসলিমরা খোদাকে আল্লাহ কেন বলে	৯৫
*বিজ্ঞানের অপরিপূর্ণ ব্যাখ্যায় —ইসলামি আকিদায় কু প্রভাব	৯৬
*মানুষের জন্য আমিষ খাবার কি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ	৯৭
*মিডিয়া ও ইসলাম	১০৩
১৭. উপসংহার	১০৮

ভুমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তা'য়ালার। আমরা শুধুমাত্র তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং শুধুমাত্র তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি সমস্ত অকল্যাণ থেকে। আল্লাহ তা'য়ালা যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর তিনি যাকে পথহারা করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। দরুদ এবং সালাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওতা সাল্লাম এর উপর। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা এক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।" (সূরা আলাক: আয়াত ০১-০৫)

Islam is the complete code of life অর্থাৎ ইসলাম হল পূণাংগ জীবন ব্যবস্থা। এখানে রয়েছে মানব জীবনের পূণাংগ গাইডলাইন।
“প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।“ -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ যদি নামাজ পড়তে চায় তাহলে তাকে আগে নামাজ শিখতে হবে। ঠিক তেমনভাবে ইসলামের প্রতিটা ক্ষেত্রে জানতে হবে কোরআন এবং হাদিস থেকে বিস্তারিত।

কেউ যদি লেনদেন করতে চায় তাকে অবশ্যই সুদ/রিবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. বলেছেন,

‘প্রচলিত লেনদেন সম্পর্কে না জেনে কেউ যেন আমাদের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করতে না আসে| অন্যথায় সে অভিশপ্ত ‘রিবা’-য় জড়িয়ে যেতে পারে|’ আমাদের নিজেদের এবং এই সমাজকে রিবা/সুদমুক্ত করার জন্য নিজেকে এ নিয়ে বিস্তারিত জানতেই হবে। এখানে স্বল্প পরিসরে আলোচনা করার চেস্টা করা হলো। কিন্তু এর আলোচনা ব্যাপক এবং সুদ/রিবা নিয়ে উস্তাযের কাছে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণের দাবি রাখে। বর্তমান সমাজের কিছু জুরুরি প্রশ্ন-উত্তর সহ দাওয়াতের কিছু পদ্ধতির নমুনা এখানে তুলে ধরার চেস্টা করা হলো।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের সম্মানিত উস্তায মুফতি যুবায়ের আহমাদ (হাফিজাহুল্লাহ), ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মারসুস উস্তায, যাদের মাধ্যমে আমাদের এই মাদ্রাসায় যাত্রার সূচনা।

প্রথম ক্লাস থেকে আমাদের অন্তরে উম্মতের প্রতি মোহাব্বত যেন সিলমোহর দিয়ে খোদাই করে দিয়েছেন আমাদের সম্মানিত উস্তাযরা। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সমস্ত উস্তাযদের খেদমতগুলো কবুল করে নিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসে রাসূল সা: এর সাথে উঁচু মর্তবা দান করুক। আল্লাহুম্মাহ আমিন।

আমরা যারা থিসিসে অংশগ্রহণ করেছি আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তা'য়ালা যেন আমাদেরকে এই প্রচেস্টাকে উম্মাহর খেদমতে কবুল করেন নেন, আমাদের সবাইকে কবুলযোগ্য তলিবে ইল্ম হিসেবে কবুল করে নেন, এই উসিলায় নাজাতের ব্যবস্থা করে দেন, আমরা যেন হাশরের ময়দানে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে কবুলযোগ্য তলিবে ইল্ম,কবুলযোগ্য দাঈ হিসেবে উঠতে পারি। আমিন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য সেই সকল দোয়া কবুল করুক যা যা করেছেন ইব্রাহিম (আ:) ও রাসূল (সা:) নিজ ও নিজ উম্মতের জন্য। আমিন

আমরা চেস্টা করেছি নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করার জন্য। তবুও ভুলভ্রান্তি থাকা মানবীয় বৈশিষ্ট্য। তাই আমাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ক্ষমা-সুন্দর দৃস্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো

রিবা/সুদ কি?

বিভিন্ন প্রয়োজনে একজন অপরজন থেকে টাকা ধার নিয়ে থাকে| সাধারণত যে পরিমাণ অর্থ ধার নেয়া হয় ঐ পরিমাণই ফেরৎ দেয়া হয়| কিন্তু যখন শর্ত করা হয়, ধার হিসেবে যা দেয়া হল, ফেরৎ দেয়ার সময় এর অতিরিক্ত আরো কিছু দিতে হবে তখন সেই অতিরিক্তটাই 'রিবা' বা 'সুদ' বলে বিবেচিত হয়| সাধারণত আমাদের সমাজে একেই 'সুদ' বলা হয়| তবে ইসলামে এর বাহিরে রিবার আরো কিছু প্র্যাক্টিস রয়েছে|

সুদের শাব্দিক বিশ্লেষণ:

'সুদ' শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কম-বেশি এর প্রচলন আছে| একেক ভাষায় একেক নামে পরিচিত| এখানে কয়েক ভাষায় সুদ এর অর্থ আলোচনা করা হল

ইংরেজী:

ইংরেজীতে সুদের প্রতিশব্দ সাধারণত দুটি| যথা: Interest (ইন্টারেস্ট) ও Usury (ইউজারী)| তবে এর মধ্যে 'ইন্টারেস্ট' শব্দটিই বহুল প্রচলিত| ইংরেজী ভাষার বিখ্যাত অভিধান Oxford ডিকশনারীতে Interest সম্বন্ধে বলা হয়েছে, Interest money (Finance): "The extra money that you pay back when you borrow money or that you receive when you invest money."

"ফিন্যান্সে সুদ হল 'অতিরিক্ত অর্থ', যা আপনাকে কারো থেকে টাকা ধার নিলে ফেরৎ দিতে হয়| অথবা আপনি যখন কাউকে অর্থ প্রদান করেন তখন অতিরিক্ত যে অংশটি গ্রহণ করেন সেটা হচ্ছে Interest (ইন্টারেস্ট/সুদ)|"

একই অভিধানে Usury সম্বন্ধে বলা হয়েছে, Usury: (Old-fashioned) the practice of lending money to people at unfairly high rates of interest. Usury (পুরনো পরিভাষা) হল, উচ্চহারে জনগণকে সুদ প্রদানের শর্তে ঋণ প্রদান করার বিশেষ অনুশীলন|"

বাংলা:

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক অভিধানে ‘সুদের’ অর্থ লেখা হয়েছে, ‘ঋণ গ্রহণ বাবদ ঋণের পরিমাণের হিসেবে যে অতিরিক্ত লাভ দেয়া হয়; সেটা হল সুদ|’ ‘সংসদ’ অভিধানে আছে, “সুদ হল, গৃহিত ঋণের পরিমাণের উপর যে মূল্য নেওয়া হয়|” ‘বঙ্গিয় শব্দকোষ’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে, ‘সুদ- বি [ফা সূদ]- কুসিদ, বুদ্ধি|

ফার্সি:

বাংলায় ব্যবহৃত ‘সুদ’ শব্দটি মূলত ফার্সী| উর্দূতেও ‘সুদ’ শব্দটি ব্যবহার হয়| ফার্সী ভাষার নির্ভরযোগ্য অভিধান ‘কেশোরী’-তে ‘সুদের’ অর্থ লেখা হয়েছে,

“সুদ- লাভ, সুবিধা পাওয়া, বৃদ্ধি, গৃহিত ঋণের পরিমাণের উপর হিসাবপূর্বক অতিরিক্ত যা গ্রহণ করা হয়|

উর্দূ:

বিশিষ্ট উর্দূ অভিধানবিদ আলহাজ্ব মৌলবী ফিরোজ উদ্দিন লিখেছেন, ‘সুদ হচ্ছে কৃত ঋণের অর্থের উপর লাভ নেয়া’|

আরবী:

বাংলায় ‘সুদ’ বা ইংরেজীতে ‘ইন্টারেস্ট’ বলতে যা বুঝানো হয় আরবীতে এর প্রতিশব্দ হল, الربا ‘আর-রিবা’ বা ‘রিবা’| শব্দটি দু’ভাবে লেখা যায়| যথা:

১. ‘বা’ অক্ষরের পর সরাসরি ‘আলিফ’ দিয়ে| যেমনটি এখানে লেখা হয়েছে|

২. ‘বা’ বর্ণের পর ‘ওয়াও’ বর্ণ দিয়ে| যেমন, الربو | উচ্চারণ অভিনড়ব| শেষোক্ত পদ্ধতিটি কুরআনুল কারীমে অনুসৃত হয়েছে| বর্তমান আরবী ভাষায় প্রথম পদ্ধতিতেই ‘রিবা’ শব্দটি লেখা হয়| ‘রিবা’ শব্দটির শব্দমূল বা মাদ্দাহ্ হল, ‘রা’, ‘বা’ এবং ‘ওয়াও’ (ر ب و)| এর মূল অর্থ, الزيادة،والنمرء،،واللو অর্থাৎ ‘অতিরিক্ত, বৃদ্ধি ও উচুঁ|’ যেমন, কোন বস্তু বৃদ্ধি পেলে বলা হয়, را الشرء، ‘বস্তুটি বৃদ্ধি পেয়েছে’| এখান থেকে উঁচু ভূমিকে বলা হয় ‘রাবওয়াহ্’ (الربة)

সারকথা:

আরবী ভাষায় আভিধানিকভাবে ‘রিবা’ বলতে বুঝানো হয়, অতিরিক্ত হওয়াকে| এটি ব্যাপক| অতিরিক্তটা বিভিন্নভাবে হতে পারে| ঋণের উপর হতে পারে| বকেয়া মূল্যের উপর হতে পারে| সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনেও হতে পারো

তথ্যসূত্রঃ

* Oxford Advanced Leaener's Dictionary, ৮ম edition, প্রকাশকাল:২০২৫ ইং, পৃ. ৮১২

*প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০৫

*বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান। প্রকাশকাল:২০১১, পৃ. ১১৫৭

*সংসদ অভিধান, পৃ. ৮৩৮

*মৌলভী সায়্যেদ তাসাদ্দুক হুসাইন রেজভী। লুগাতে কিশোরী, দারুল ইশাআত, করাচি, প্রকাশকাল: ১৯৮৯ ইং, পৃ. ২৬

'রিবা' শব্দ ও অন্যান্য শব্দের মাঝে তুলনা

আমরা দেখলাম, আভিধানিকভাবে আরবী ছাড়া আলোচিত অন্যান্য প্রায় ভাষাতেই সুদ বলতে বুঝানো হয়েছে, প্রদত্ত ঋণের উপর অতিরিক্ত প্রদান| তবে আরবী ভাষায় বুঝানো হয়েছে, অতিরিক্ত কিছুকে| মূলত ইসলাম যে সুদকে নিষেধ করেছে সেটার সাথে আরবী ভাষার 'রিবা' শব্দটিই অধিক উপযুক্ত| কারণ ইসলামে শুধু প্রদত্ত ঋণের উপর অতিরিক্ত আদান-প্রদান-ই সুদ নয়; বরং বকেয়া মূল্য, সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনে অতিরিক্ত আদান-প্রদানও সুদ| অতএব 'সুদ' বুঝানের জন্য আরবী ভাষার 'রিবা' শব্দই অধিক উপযুক্ত| এছাড়া অন্যান্য শব্দ তথা 'সুদ' বা 'ইন্টারেস্ট' মূলত ইসলামে নিষিদ্ধ রিবার ক্ষতি উপস্থাপন| এ কথাটি নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয়

মুফতী শফী রহ. এর একটি ভাষ্য: রিবা ও সুদ এক নয়; বরং সুদ রিবার একটি অংশমাত্র পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতী শফী রহ. লিখেছেন, কুরআনুল কারীমে যে বিষয়টিকে 'রিবাল হারাম' বা 'নিষিদ্ধ রিবা' আখ্যায়িত করা হয়েছে, তার তর্জমা উর্দূ ভাষার সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সাধারণভাবে 'সুদ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়| যার কারণে মনে করা হয় যে, রিবা এবং সুদ একই বিষয়ের দুইটি নাম| কিন্তু বাস্তবতা এমনটি নয়; বরং 'রিবা' একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়কে বুঝায়| উর্দূতে প্রচলিত 'সুদ' তার একটি প্রকার মাত্র| রিবার ভাবার্থ এর থেকে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক| এর মাঝে

লেনদেন ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত অনেক এমন আর্থিক কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত যাতে ঋণের আদান-প্রদান মোটেও নেই| অথচ সেগুলোও 'রিবা'|

সুতরাং রিবাকে 'রিবা' বলাই কাম্য| সুদ বা Interest নাম দিয়ে এর পরিধি (Scope)-কে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া ঠিক হবে না; বরং আমরা বলতে চাই, 'রিবা' একটি শরঈ পরিভাষা| এর অনুবাদ 'সুদ' বা 'ইন্টারেস্ট' দিয়ে করা ঠিক নয়| এতে কখনো ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে|

কুরআনুল কারীমে 'রিবা' শব্দের ব্যবহার

কুরআনুল কারীমে ‘রিবা’ শব্দটি তার প্রসিদ্ধ অর্থে আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে মোট সাত জায়গায় ব্যবহার হয়েছে| তা হল: সূরা বাকারায় ২৭৫ নং আয়াতে ৩ বার, ২৭৬ নং আয়াত ও ২৭৮ নং আয়াত, সূরা আলে ইমরান ১৩০ নং আয়াত ও সূরা নিসা ১৬১ নং আয়াত| আর আলিফ লাম ছাড়া শুধু ‘রিবা’ শব্দটি কেবল সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে| তদ্রূপ রিবা শব্দটি বিভিন্নভাবে রুপান্তরিত হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে মোট দশ জায়গায়|

রিবা বিষয়ে কেন জানতে হবে?

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “মানুষ যা জানত না তিনি তা তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন” (সূরা আলাক: আয়াত নং ৫)

মূলত অজানা বস্তু বা কোন বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাকে শিক্ষা দান করে থাকেন| মানুষ জানত না কিভাবে কৃষিকাজ করতে হয়, জানত না চিকিৎসা বা অন্যান্য বিষয়েও| আল্লাহ তায়ালা মানব জাতীর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন মাধ্যমে তা জানিয়েছেন| শিক্ষা দিয়েছেন| আল্লাহ তায়ালা বলেন, “তিনি আদমকে যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা দিয়েছেন”| (সূরা: বাকারা, আয়াত নং ৩১)

‘রিবা’ নিয়মিত শিখতে হবে

Islam is the complete code of life অর্থাৎ ইসলাম হল পূণাংগ জীবন ব্যবস্থা। এখানে রয়েছে মানব জীবনের পূণাংগ গাইডলাইন।

“প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।“ -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২

জীবনের পূণাঙ্গ গাইডলাইন| ইবাদাতের বিষয়ে যেভাবে এত রয়েছে বিস্তারিত শরীয়া| মুআমালা বা লেনদেন বিষয়েও রয়েছে ইসলামী শরীয়ার বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা| তাই লেনদেনের পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শরীয়া জেনে নেয়া জরুরী |

কেন?

*লেনদেন সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় জেনে নিয়ে হালালভাবে লেনদেন করতে

*হারাম লেনদেন থেকে বাঁচতে

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. বলেছেন,

لا يتجر في سوقنا إلا من فقه، وإلا أكل الربا.

'প্রচলিত লেনদেন সম্পর্কে না জেনে কেউ যেন আমাদের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করতে না আসে| অন্যথায় সে অভিশপ্ত 'রিবা'-য় জড়িয়ে যেতে পারে|'
কেউ যদি নামায পড়তে চায়, তাহলে আগে তাকে নামাজ শিখতে হবে| শরীয়াহ্ আলোকে জানতে হবে নামাযের পদ্ধতি কী? তেমনি কেউ যদি 'রিবা' থেকে বাঁচতে চায়, তাহলে তাকে তা শিখতে হবে| এখানে শেখার গুরুত্বটা অনেক কারণেই একটু বেশি| কারণ রিবার প্রয়োগ ও ব্যাপ্তী অনেকটাই জটিল| বিভিন্ন ধরনের রিবাকে শরীয়াহ্তে নিষেধ করা হয়েছে| কুরআনুল কারীমে এক ধরনের রিবাকে নিষেধ করা হয়েছে| হাদীসে এর সাথে আরো কিছু লেনদেনকেও রিবা হিসাবে নিষেধ করা হয়েছে|

এর পাশাপাশি হাদীস ও সুন্নাহয় রিবা নিষিদ্ধতার কিছু নীতিমালা বলে দেয়া হয়েছে| সেই সব নীতিমালার আলোকে পরবর্তী ফকীহগণ প্রচলিত আরো কিছু লেনদেনকে রিবা আখ্যায়িত করেছেন| শুধু তাই নয়, আধুনিক সুন্নাহ লেনদেনে কোনটা রিবাযুক্ত, কোনটা রিবামুক্ত, এ নিয়েও ফকীহগণের বিস্তর কথা রয়েছে| আল্লাম্মা ইবনে কাছীর রহ. (মৃত: ৭৭৪হি.) যথার্থই বলেছেন,

'রিবা বিষয়টি অনেক জ্ঞানী লোকের কাছেই জটিল একটি বিষয়'|

তাই আমাদের জন্য জরুরী হল, রিবা সম্পর্কে প্রাথমিক ও প্রায়োগিক বিষয়গুলো জেনে নেওয়া| এখানে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার চেস্টা করা হলো। বিস্তারিত কোন শায়েখের তত্ত্বাবধানে কোর্স করলে আরো উত্তমভাবে বিস্তারিত জানার সুযোগ হবে ইন শা আল্লাহ

রিবার ভয়াবহতা: কুরআনুল কারীম, সহীহ হাদীস ও আছার থেকে

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত রিবার আয়াতসমূহে সুদখোরের ব্যাপারে ৫ ধরনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে| যথা:

- সুদখোর কেয়ামতের দিন কবর থেকে পাগলের মত উঠবে ও চলবে| কারো মতে, পেট ফুলে যাবে| দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাবে| এভাবে পাগলের মত চলবে|
- সুদখোরের সম্পদ মিটিয়ে দেওয়া হবে| বরকত উঠিয়ে নেয়া হবে| সম্পদে তার প্রয়োজন পূরণ হবে না| সম্পদ চুরি হবে, যুলুমের শিকার হবে| এমনকি তার পরবর্তী প্রজন্মেও এর কু-প্রভাব থেকে যাবে| তেমনিভাবে সুদী টাকায় আদায়কৃত হজ্জও কবুল হবে না|
- সুদখোরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের যুদ্ধের ঘোষণা| আলস্নাহ তায়ালা বলেন, "যদি তোমরা (সুদ) না ছাড়, তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও"

এটা অত্যন্ত ভয়ংকর বিষয়| ইমাম আবু হানিফা রহ. (মৃত ১৫০ হি.) বলেছেন,

'নিশ্চয় এ আয়াতটি কুরআনুল কারীমের মধ্যে সবচেয়ে ভীতিকর আয়াত'

ইমাম মালেক রহ. (মৃত: ১৭৯ হি.) বলেছেন,

'আমি আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ তালাশ করেছি| তবে রিবার চেয়ে অধিক মন্দ ও ভয়ংকর কিছু পাই নি| কারণ, রিবার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা যুদ্ধের ঘোষণা করেছেন'|

- যারা সুদকে বৈধ মনে করবে তারা ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে| কাফের হয়ে যাবে|
- যারা সুদের নিষিদ্ধতা জানার পরও তাতে জড়াবে তারা জাহান্নামী হবে| আর যারা জড়ানোর পাশাপাশি সুদের বিধানকে অস্বীকার করবে, সুদ ও ব্যবসাকে এক বলবে তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে

রিবার ভয়ানহতা: সহীহ হাদীসের আলোকে

কুরআনুল কারীমের পাশাপাশি সহীহ হাদীসেও রিবার বিভিন্ন ভয়াবহ দিক উল্লেখ করা হয়েছে| প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কর্ম ও বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা উম্মতকে রিবা বিষয়ে কতইনা সতর্ক করেছেন! আফসোস, আজ আমরা এর থেকে কত গাফেল!! নিম্নে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ সহীহ হাদীস থেকে রিবার ভয়াবহতার কিছু দিক তুলে ধরা হল:

সুদখোর, সুদদাতা, সুদীচুক্তি লেখক ও সাক্ষী দানকারী অভিশপ্ত

হযরত আব্দুলস্নাহ ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহীতা, সুদ প্রদানকারী, সুদের সাক্ষী ও সুদের লেখকদ্বয়কে অভিশম্প াত করেছেন|'

হযরত জাবের ইবনে আব্দুলস্নাহ্ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক, সুদের সাক্ষীদ্বয়কে লা'নত করেছেন| এবং তিনি বলেছেন, এখানে সবাই সমান গুনাহের অংশীদার|"

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:

লা'নত বলতে কি বোঝায়?:

'লা'নত' (لَعْنة) শব্দটি আরবী শব্দ| এর শাব্দিক অর্থ: الطر وابيعا عن ا ير অর্থাৎ বিতাড়িত করা, সকল কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া|

প্রখ্যাত মুহাদ্দীস ও অভিধানবিদ মুহাম্মাদ তাহের পাটনী রহ. (মৃত: ৯৮৬হি./১৫৭৮ইং) লিখেছেন,

'লা'নত এর শাব্দিক অর্থ হল: বিতাড়িত করা, দূরে সরিয়ে দেয়া| এখানে উদ্দেশ্য হল- আযাব বা শাস্তি ভোগ করা| এবং জান্নাতে প্রথমবার প্রবেশ করা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া|'

বুঝা গেল, কোরআন-হাদীসের আলোকে কোন মুসলিম লানতপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল- আল্লাহ রহমত ও কল্যাণ থেকে বিতাড়িত হওয়া, আখিরাতে শাস্তির সম্মুখিন হওয়া ও সরাসরি

জান্নাত প্রাপ্তির নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া| বাংলায় এর কাছাকাছি শব্দ 'অভিশাপ' বা 'অনিষ্ট কামনা'|

হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী যারা যারা রিবার সাথে সম্পৃক্ত তারা আল্লাহ্ তায়ালার রহমত থেকে দূরে থাকবে| অর্থ সম্প দের যে কল্যাণ ও বরকত তা থেকে বঞ্চিত হবে| সম্প দ বাহ্যত বৃদ্ধি হবে| তবে প্রয়োজন শেষ হবে না| প্রশান্তি আসবে না| এতো দুনিয়ার শাস্তি | আর আখিরাতে অপেক্ষা করছে সীমাহীন আযাব ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি | এবং তারা সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না| বলাবাহুল্য এ এক কঠিন শাস্তির বার্তা|

আর এ অভিশাপ শুধু সুদখোরের জন্য নয়; বরং রিবার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট সকলের| হাদীসে সকলকে সমান অভিশাপের ভাগিদার সাব্যস্ত করা হয়েছে|

উপরোক্ত হাদীসে মোট চার শ্রেণীর লোককে লা'নত করা হয়েছে| যথা: সুদগ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের সাক্ষীদাতা ও সুদের লেখক| নিম্নে প্রত্যেকটির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

১. সুদগ্রহীতা:

'সুদগ্রহীতা' বলতে বুঝানো হয়েছে, যে কাউকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে সুদ গ্রহণ করে| যেমন, সুদী ব্যাংকে টাকা জমা করে সুদ গ্রহণ করা| তদ্রূপ নির্দিষ্ট বকেয়া মূল্যের উপর মেয়াদ অতিরিক্ত গ্রহণ করা, সমজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করা, বন্ধকী দ্রব্য ভোগ করা| মোটকথা, সুদের যত প্রকার আছে সবক্ষেত্রে সুদগ্রহীতা এর অন্তর্ভুক্ত | তদ্রূপ সুদখোর থেকে সুদের টাকা জেনে-বুঝে অন্য কেউ গ্রহণ করা সেও এর অন্তর্ভুক্ত |

প্রকাশ থাকে যে, এখানে সুদের চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত | সুতরাং সুদ গ্রহণ না করলেও সুদী চুক্তিই লা'নতের কারণ হবে|

২. সুদদাতা:

'সুদদাতা' বলতে বুঝানো হয়েছে, যে সুদ ভিত্তিক লেনদেনে সুদ প্রদান করে| যেমন, ব্যাংক থেকে সুদ ভিত্তিক অর্থ গ্রহণ করে সুদ প্রদান করা, বকেয়া মূল্যের উপর অতিরিক্ত প্রদান করা, ক্রেডিট কার্ডের অর্থ পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত প্রদান করা ইত্যাদি| মোটকথা, সুদের যত প্রকার আছে সবক্ষেত্রে সুদদাতা এর অন্তর্ভুক্ত |

৩. সুদের সাক্ষী দানকারী:

সুদী লেনদেনে সাক্ষী থাকার অর্থ, সরাসরি জেনে-বুঝে ইচ্ছাকৃত সুদী কারবারে এভাবে সাক্ষী হওয়া যার মাধ্যমে সুদী কারবারটি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা হয়| এটি হতে পারে মৌখিক ভাবে সাক্ষী থাকা বা লিখিতভাবে থাকা| মূল হল, সাক্ষী থাকার মাধ্যমে সুদী কাজে সহযোগিতা করা| যার সহযোগিতায় সুদী লেনদেন পূর্ণতায় পৌঁছে| যেমন, বন্ধকী দ্রব্য বন্ধকগ্রহীতা ভোগ করবে এর উপর সাক্ষী থাকা| সুদ ভিত্তিক ঋণ প্রদানের চুক্তিতে সরাসরি সাক্ষী থাকা|

উপরোক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী সুদের সাক্ষীদাতাকে লা'নতের কারণ হল, অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা|

৪. সুদী লেনদেনের লেখক:

সুদী লেনদেন লিখে রাখা| এর অর্থ হল, সরাসরি মূল সুদী চুক্তি লিখে সুদী লেনদেন সম্পাদনে সহযোগিতা করা| যার মাধ্যমে সুদী লেনদেন পূর্ণতায় পৌঁছে| যেমন, কেউ কাউকে সুদ ভিত্তিক ঋণ দিতে রাজী হল| এরপর সেটা বাস্তবায়নের জন্য মূল চুক্তি সম্পন্ন করার সময় কাউকে ডেকে বলল, চুক্তিটি লিখে রাখতে|

তথ্যসূত্রঃ

*ইমাম মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নাইসাবুরী রহ. মৃত: ২৬১ হি. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বুয়ু, বাবুর রিবা, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা, হাদীস নং ১৫৯৮, খ. ২, পৃ.২৭

*আল-জাওহারী, আবু নাসর ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ, মৃ: ৩৯৮হি. আস-সিহাহ, দারুল হাদীস, আল-কাহেরা, প্রকাশকাল: ২০০৮ ইং, পৃ.১১৩৯

*তাহের আল-ফাত্তানী, মুহাম্মদ তাহের আস-সিদ্দীকী আল হিন্দী আল-ফাত্তানী আল-গুজরাটি, মৃত:৯৮৬হি./১৫৭৮ ইং, মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার মাকতাবায়ে দারুল ঈমান, মদীনা মুনাওয়ারাহ, প্রকাশকাল: ১৯৯৪, খ.৪, পৃ.৫০

সুদখোরের সাথে কোন সমঝোতা নেই:

একবার নাজরানের (Najran) খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে| তাঁরা মসজিদে নববীতে একত্রিত হয়| আসরের পর তারা এসেছিল| খ্রিস্টানদের নামাযের সময় হয়| তারা মসজিদে নববীতেই তাদের নামায পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল|

এ অবস্থা দেখে সাহাবীগণ মসজিদে নববীতে নবীজীর উপস্থিতিতে তাদের ধর্মের নামায পড়তে দেখে তাদেরকে বাধা দিতে চাইলেন|

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইতিহাসে এক নজীরবিহীন অসাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন| তিনি উল্টো মুসলমানদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, "তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না| ছেড়ে দাও|" এরপর তারা মসজিদে নববীতেই উল্টোদিকে নামায আদায় করল|

উক্ত নাজরানবাসী খ্রিস্টানদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন,

"যদি তোমরা সুদী লেনদেন কর, তবে তোমাদের সাথে আমাদের কোন সুলাহ (Treaty of Peace) নেই| যে সুদ গ্রহণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সুলাহ করতেন না|"

লক্ষ্য করুন, তারা ছিল অমুসলিম; খ্রীস্টান| মসজিদে নববীতে প্রকাশ্যে নবীর উপস্থিতিতে বিভিন্নভাবে নামায আদায় করল| নবীজী তা মেনে নিলেন| কিন্তু সুদের প্রশ্নে কোনো আপোষ করলেন না| সুতরাং বুঝা গেল সুদের সাথে কোনো আপোষ নয়; বরং সুদ প্রতিরোধ করাই সমাধান|

এক হাদীসে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'যখন কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচার ও সুদ ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা নিজেরা নিজেদের উপর আল্লাহর আযাবকে অনিবার্য করে নেয়|'

বর্তমানে যেসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্যোগ আসে সেগুলো ঘটার পেছনে বাহ্যিক বৈষয়িক কারণ ছাড়াও হাদীসে বর্ণিত কারণগুলোও অন্যতম; বরং প্রধান কারণ এগুলোই| তাই বৈষয়িক

কারণ খোঁজে সেগুলো থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি আযাব-গযব হওয়ার যেসব কারণ কুরআন-হাদীসে উলেক্ষ্য হয়েছে, যেমন উপরোক্ত হাদীসে 'যিনা'ও 'সুদ'-কে আযাবের কারণ বলা হয়েছে, এগুলো থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক| এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই| কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

"মানুষের কৃতকর্মের দরুণ স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে; যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে|" (সূরা রুম: আয়াত নং ৪১)

অর্থাৎ দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দেয়, যেমন: দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকান্ড, ভুমিকম্প , শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য, ইত্যাদি| এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহর্ তাআলার হুকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া| তাই আমাদেরকে অন্যায় ও পাপাচার থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে| অন্যথায় শুধু বাহ্যিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার যত ব্যবস্থাই নেয়া হোক না কেন তা তেমন কাজে আসবে না| দুটির সমন্বয় করতে হবে| পাপাচার থেকে বাঁচতে হবে, সতর্কতাও অবলম্বন করতে হবে|

সুদ একটি ধ্বংসাত্মক বিষয়

সুদ শুধু অভিশপ্তই নয়: ধ্বংসাত্মকও বটে| হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

" তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে বেঁচে থাক| সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এগুলো কী কী? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপন করা, যাদুটোনা করা, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ তায়ালা নিষিদ্ধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তার জীবন সংহার করা, সুদখোর, ইয়াতিমের সম্প দ ভোগ করা, যুদ্ধ ক্ষেত্রে হতে পলায়ন করা, সতী-সাধ্বী মহিলার বিরূদ্ধে যিনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া|"

এই হাদীসে যে সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকার প্রতি জোর প্রদান করা হয়েছে এগুলো অনেক ভয়াবহ ও নিকৃষ্ট গুনাহ| যার কারণে এগুলোকে ধ্বংসাত্মক বলা হয়েছে| অর্থাৎ এগুলো মানুষকে ও তাদের ঈমানের রূহ্কে একেবারে ধ্বংস করে দেয়|

চিকিৎসকগণ বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি, গুণ বলে থাকেন, অমুক বস্তুতে এই পরিমাণ পুষ্টি আছে, অমুকটা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ইত্যাদি| তেমনি আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুসমূহ উক্ত হাদীসে বাতলে দিয়েছেন| ভাবার বিষয় হল, চিকিৎসকগণের বক্তব্য অভিজ্ঞতানির্ভর হয়| যা ভুলও হতে পারে| তারপরও আমরা তাদের কথায় আস্থা রাখি| যথাসাধ্য মেনে চলার চেষ্টা করি| কিন্তু নবীগণের কথা হয় সম্পূর্ণ সঠিক; ওহীপ্রাপ্ত সংবাদ| যাতে ভুলের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই| এরপরও আমরা অনেক সময় তা ভ্রুক্ষেপ করি না! মেনে চলার সৎ চেষ্টা করতে চাই না!!

তথ্যসূত্রঃ

*বর্তমানে সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বৃহৎ শহর।

*ইবনে আবী শাইবা, আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী শাইবা, মৃত-২৩৫হি., আল-মুসান্নাফ, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামীয়্যাহ, করাচি, খ.১১, পৃ. ৩১৯-৩২০, ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযী, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আয়্যুব, মৃত:৭৫১, মাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ, মুআসসাসাতু মালিক, কাহেরা, প্রথম প্রকাশ, খ.২, পৃ. ৪৭৬; মাজমুআতুল ওছায়িকুছ সিয়াসিয়্যাহ, ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ১৭৬,১৭৯
*বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, (২৫৬হি./৮৭০খৃ.] আল-জামিউল সহীহ (সহীহ বুখারী), কিতাবুল ওয়াসায়া, বাবু কওলিল্লাহি তায়ালা 'ইন্নাযিনা ইয়াকুলূনা আমওয়ালাল ইয়াতামা', নাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা, হাদীস নং ২৬৮৫, খ.১, পৃ.৩৮৮

রিবা: পরকালে অকল্পনীয় ভয়াবহ শাস্তির কারণ

হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল| আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম| নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে| তার সামনে পাথর পড়ে আছে| নদীর মাঝের লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায়, তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেয়| এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায়, ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে| আর সে স্বস্থানে ফিরে আসে|

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে? সে বলল, যাকে আপনি রক্তের নদীতে দেখেছেন, **সে হল সুদখোর**|"

উক্ত হাদীসে কতটা ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে, তা লেখার মত নয়; শুধু চোখ দুটি বন্ধ করে ভাবার বিষয়| আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাযত করুণ |

তথ্যসূত্রঃ

*বুখারী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, (২৫৬হি./ ৮৭০ খৃ.), আল-জামিউস সহীহ (সহীহ বুখারী) কায়রো, দারুল হাদিস, হাদীস নং -২০৮৫

রিবার বিরুদ্ধে নবীজীর পাহাড়সম দৃঢ়তা ও ঐতিহাসিক ঘোষণা

হিজরী ১০ম| বিদায় হজ্ব| ইসলামের ঐতিহাসিক হজ্ব| নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক যিন্দেগীর বিদায়ী হজ্ব| লক্ষাধিক সাহাবী এবারের হজ্বে অংশগ্রহণ করেছেন| ইসলামে এটিই প্রথমবারের মত সবচেয়ে বড় হজ্ব| এ হজ্বে আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা আজও মানুষকে উজ্জিবীত করে| উম্মতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহু দিক-নির্দেশনা তাতে রয়েছে| এ ভাষণের একটি অংশ ছিল 'সুদ' সংক্রান্ত| হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের রা. থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের দিন লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "...জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত করা হল| আর আমি প্রথমেই আমাদের রক্তের দাবীর মধ্যে ইবনে রাবী'আ ইবনে হারিসের রক্তের দাবী রহিত ঘোষণা করলাম| ...এভাবে জাহেলী যুগের সকল প্রকার সুদ রহিত করা হল, আর আমাদের সুদের মধ্যে যে সুদ আমি সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষণা করছি তা হল (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের সুদ| এ সুদ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হল|"

লক্ষ্যণীয় বিষয়:

- সুদ মূলত নিষিদ্ধ হয়েছে সেই ৩য় হিজরীতেই| এখানে কেবল পুনঃঘোষণা করা হয়েছে| এ নয় যে, বিদায় হজ্বে দশম হিজরীতে সুদ নিষেধ হল| এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে|
- অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নবীজী সুদের নিষিদ্ধতার পুনঃঘোষণা শুনিয়ে দিলেন| সাথে সাথে সকলের সম্মুখে সুদ নিষিদ্ধতার আগে করা লেনদেন থেকে সৃষ্ট চাচা আব্বাস রা. এর অন্যের কাছে পাওনা সুদের অংশের দাবি ছেড়ে দেয়ার পুনঃঘোষণা দিলেন|
- রিবা নিষিদ্ধতার আগে আব্বাস রা. যে সুদী লোন দিয়েছিলেন সেটা ছিল কমার্শিয়াল লোন| ইতিহাসে এর পরিমাণ উলেক্ষ হয়েছে, দশ হাজার মিসকাল স্বর্ণ|২১ প্রায় ৩,৭৫০ ভরি সোনা| ভরি প্রতি: ৬০,০০০/-টাকা ধরা হলে, ৬০,০০০ × ৩,৭৫০ = ২২,৫০,০০,০০০ (বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)| অর্থাৎ সুদ! মূল পুঁজি (Principal) নয়| সুদ যদি হয় এ পরিমাণ, তবে মূল পুঁজির পরিমাণ কত?!!
- চিন্তার বিষয় হল, হারাম থেকে বাঁচার জন্য বাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ছেড়ে দেয়া হল! আমরা হারাম থেকে বাঁচার জন্য কয় টাকা ছাড়ি!!

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচার দ্বারা শুরু করলেন| এটি স্পষ্ট করার জন্য যে, এই আদেশটি রাষ্ট্রিয় কোন ফরমান নয়| যেখানে সাধারণত নিকটাত্মীয়দের ছাড় দেয়া হয়ে থাকে| আর অন্যদের কষে ধরা হয়; বরং এটি ঐশী ফরমান| যা নিজেদের আগে মানা দরকার|

সমাজে রিবা ছড়িয়ে পড়া কেয়ামতের আলামত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

“কেয়ামতের সময় যখন নিকটবর্তী হবে তখন সমাজে সুদ, যিনা ও মদ ছড়িয়ে পড়বে|”

চিন্তা করার বিষয়, আজ আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছি| অথচ আমাদের দ্বারাই কেয়ামতের আলামতগুলো প্রকাশ পাচ্ছে| এখানে কি আমাদের কিছুই করার নেই?

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেটাকে হাদীসে অভিশপ্ত, দুর্যোগের কারণ, কেয়ামতের আলামত বলে চিহ্নিত করা হল, সেটাকেই আমরা পশ্চিমা বিশ্বের সুরে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বা আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের হাতিয়ার মনে করছি!

তথ্যসূত্রঃ
*ইমাম মুসলিন, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নাইসাবুরী রহ. মৃত: ২৬১ হি., সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু হাজ্জাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা, খ.১, পৃ.৩৯৭
*আল-হাইসামী,নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর ইবনে সুলায়মান, মৃত: ৮০৭ হি. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ,বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: ২০০১ইং, হাদিস নং ৬৫৮২

রিবার সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি

ইসলাম একটি শাশ্বত ধর্ম| সকল পেশার সকল বর্ণের সকল ধর্মের মানুষের জন্য এ এক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা ধর্ম| মানুষের জীবন যত ব্যাপক ইসলাম এর থেকেও ব্যাপকতর ও বিস্তৃত | ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক তথা মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের সফল বাস্তবায়ন হোক এটিই এ ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য|

এটিই একমাত্র ধর্ম যাতে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার প্রতি লক্ষ রেখে বিধান আরোপিত হয়| দুনিয়া ও আখেরাতে মানব কল্যাণ নিশ্চিত হয় এমন সকল বিষয়কে হালাল| আর মানব কল্যাণ ব্যাহত হয় এমন সব বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে এ ধর্মে| মানব কল্যাণের দিকে লক্ষ্ রেখে নিষেধ করা হয়েছে এমন অনেক বিধানের মাঝে রিবা হল অন্যতম| এটি শুধু আখেরাত নয়; বরং এর কারণে মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়| নিম্নে এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হলো,

রিবার সামাজিক ক্ষতি

সুদখোর লোকেরা সাধারণভাবেই কিছুটা নির্দয় ও নির্মম প্রকৃতির হয়ে থাকে। সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অন্যের প্রতি দয়ার হাত তাদের সম্প্রসারিত হয় না। এ নিষ্ঠুরতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই গরিব শ্রেণীর লোকদের মনে প্রতিহিংসার মনোভাব সৃস্টি হয়। জলতে থাকে তাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন। মনের আগুন কখনো সমাজ দেহে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় সমাজে চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি ইত্যাদি

রিবার নৈতিক ক্ষতি

ইসলাম চায় একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী এমন সুন্দর সমাজ গঠন করতে যে সমাজের বুনিয়াদি স্তম্ভ রচিত হবে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, ভালবাসা-মহাব্বত, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর| যে সমাজের মানুষগুলো হবে পরস্পর একে অন্যের প্রতি দয়ালু মনের অধিকারী| একই অঙ্গের মত হয়ে তারা সমাজে বসবাস করবে| একজনের বিপদে পড়ে অপরজন ধেয়ে আসবে, গরীব-দুস্থদের পাশে এসে দাঁড়াবে সমাজের বিত্তশালী মানুষ|

পক্ষান্তরে সুদ চাই মহাজনী সুদ হোক বা বাণিজ্যিক, প্রাচীন কায়দায় হোক কিংবা আধুনিক কায়দায়| সবই মানব চরিত্রে আত্মসাৎ, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নির্দয়তা ও সহিংসতা ইত্যাদি বদভ্যাসগুলো জন্ম দেয়| মানবতার উত্তেলন এবং বিকাশের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে বিরাট বড় অন্তরায় | সুদী সমাজের চারিত্রিক গুণাবলির আদৌ কোন স্থান নেই| ঋণগ্রহিতা

ঋণের ভাবে অচল হয়ে পড়লেও ঋণদাতার মনে তার প্রতি কোন দয়া উদয় হয় না| সে তো সর্বদাই জবতে থাকে টাকা আর টাকা| টাকার তাসবীহ ছাড়া কোন কিছুই তার কাছে ভালো লাগে| না| এমনকি কোন পাড়াপড়শি মারা গেলেও এ ধরনের সুদখোদেরও পক্ষ থেকে কোন রকম সহযোগিতা পাওয়া যায় না| শেষ পর্যন্ত অনেকের দাফন-কাফন সম্পন্ন হয় গ্রামবাসীর চাঁদা দিয়ে|

সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা কিংবা কৃষি কাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে| অভাবী ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে এর পরিণাম অত্যন্ত করুন | কারণ, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি পেটের জ্বালা নিবারণ করার জন্য যে ঋণ গ্রহন করে তা পরিশোধ করা তার জন্য কষ্টসাধ্য বিষয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষে কখনও অসম্ভব হয়ে দাড়ায়| এমনকি এক পুঁজিপতির ঋণ পরিশোধ করতে অপর পুঁজিপতির দারস্থ হতে হয় তাকে| আবার তার পাওনা পরিশোধ করতে তৃতীয় পুঁজিপতির শরণাপন্ন হতে হয়| এমনি করে চলতে থাকে ঋণের সিলসিলা| অবশেষে বাপ-দাদার আমলের বাড়ি-ভিটা বাসন-কোসন ইত্যাদি বিক্রয় করে দায়মুক্ত হতে হয়| এতে ঋণ গ্রহীতা দুই ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়|

১| সুদী ঋণ যদি পরিশোধ করতে না পারে তাহলে ভিটা-বাড়ি বিক্রয় করে হলেও দিতে হয়| কেউ নিজের কিডনী বিক্রয় করেও সুদী ঋণ পরিশোধ বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে| অনেকে আবার এত টাকা ফেরত দিতে না পারায় পালিয়ে বেড়ায়|২৫ কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছে বলে পত্রিকার খবরে দেখা যায়| আবার অনেকের দাফন সম্পন্ন হয় গ্রামবাসীর চাঁদা দিয়ে| অর্থাৎ সুদের চাপে সহায়-সম্প ত্তি সব শেষ| ভারতের অন্ধপ্রদেশে এনজিওদেরও ক্ষুদ্র - ঋণ সুদসহ পরিশোধ করতে না পেরে মাত্র দুই সপ্তাহে কুঁড়ি জনের বেশি লোক আত্মহত্যা করেছে| আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার আত্মহত্যার খবর সেভাবে না থাকলেও অভিযোগ অন্ধপ্রদেশের মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউশানের বিরুদ্ধে উঠেছে তার সবটাই আমাদের দেশেও আছে|

২| এ অবস্থায় পতিত হওয়ার পর কোন মানুষের মধ্যে তখন আর কোন কর্মস্পৃহা বাকি থাকে না| মানসিকভাবে তখন সে এমনভাবে ভেঙ্গে পড়ে যে, জীবনে বেঁচে থাকাই তার জন্য

অসহ্যকর হয়ে দাঁড়ায়| এমনি করে সমাজের শত সহস্র কর্মক্ষম লোক কর্মস্পৃহা হারিয়ে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকে| ফলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে| এ সব কিছু হচ্ছে সুদভিত্তিক অর্থনীতির অন্যতম ফসল!!

রিবা অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার

যে কোন সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী | সুষম বণ্টন প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া ঐ জাতির অর্থনৈতিক দৈন্য কখনও দূর করা সম্ভব নয়| কারণ, এটি না থাকলে সমাজের কিছু লোকের কাছে অর্থ জমা হতে থাকবে| অর্থের ঝোঁক কেবল তাদের দিকে ধাপিত হবে| যার পরিণতিতে হাজার হাজার জনগণের সম্পদ নিংড়ে নিংড়ে কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হবে| চালাবে একচেটিয়া দখলদারীত্ব| ফলে ধনী-গরীবের বৈষম্যতা বেড়েই চলবে| বহু পুঁজিবাদি দেশে লাখ লাখ লোক এমন আছে যার একটু মাথা গোজার ঠাঁই নেই| শীতের রাতে রেল স্টেশনের ঠান্ডা মাটিতে আশ্রয় নেয়| অপরদিকে পুঁজিপতিরা টাকা খরচ করার জায়গা না পেয়ে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে!

একটি সরল উদাহরণ:

এক শিল্পপতির ব্যবসার জন্য এক কোটি টাকা প্রয়োজন| নিজের পকেট থেকে মাত্র দশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করল| আর বাকি নব্বই লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে গ্রহণ করল| এভাবে সে মোট এক কোটি টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করল| এত বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে যখন ব্যবসা করা হবে তখন তার লাভও হবে অনেক বেশি| মনে করুন, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে| সুতরাং এক কোটি হয়ে গেল দেড় কোটি টাকা|

ব্যাংক থেকে ১২% সুদে টাকা আনার কারণে এখন পুঁজিপতি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা থেকে মাত্র দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা সুদ হিসাবে ব্যাংককে প্রদান করবে| এর মধ্য থেকে ব্যাংক নিজের জন্য মুনাফা রেখে ৮% সুদ অর্থাৎ সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা সেসব জনগণের মধ্যে বণ্টন করবে যাদের আমানত তার কাছে জমা রয়েছে|

লক্ষ করুন, শিল্পপতি লাভের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পেল| এখান থেকে তার কোন খরচ নেই| পুরো পঞ্চাশ লক্ষ টাকাই তার কাছে থেকে যাবে| কারণ, সে তো ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত সুদ তার পণ্যের খরচে হিসাব করে তা জনগণ বা ভোক্তাদের থেকে নিয়ে নিয়েছে| অর্থাৎ যে পণ্যের দাম

১০০ টাকা হওয়া দরকার তা সুদের খরচসহ ১১২ টাকা ধরেছে| সুতরাং সুদের টাকা লাভের থেকে দিতে হচ্ছে না| পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে নিয়ে নিচ্ছে| সুতরাং পুরোটাই লাভ| অর্থাৎ পঞ্চাশ **লক্ষ** টাকা!

আর জনগণ নব্বই **লক্ষ** টাকা দিয়ে পেল মাত্র সাত **লক্ষ** বিশ হাজার টাকা| তাও আবার সুদ; লাভ নয়| আর ব্যাংক বাবু পুঁজি ছাড়া ঘরে বসেই ৪% সুদ বা তিন লড়্গা ষাট হাজার টাকা মুনাফা; সুদ নিয়ে নিল! অর্থাৎ ১০০ টাকায় ১২ টাকা সুদ শিল্পপতির কাছ থেকে নিয়ে জনগণকে ৮ টাকা সুদ দিয়ে বাকি থাকে ৪ টাকা|

এখানেই শেষ নয়, পুঁজিবাদিদের জনগণকে চুষে খাওয়ার চিত্র দেখুন, এখন বাজারে তো শিল্পপতির পণ্য যা সে ১০০ টাকার পণ্য ১১২ টাকা করে বিক্রয় করছে; অর্থাৎ সুদসহ| বেচারা ভোক্তা/ জনগণ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত (শতকরা) ৮ টাকা সুদের লাভ নিয়ে যখন বাজারে যায়| তখন প্রতি ১০০ টাকায় তার ১২ টাকা বেশি খরচ গুণতে হয়| সুতরাং ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে প্রাপ্ত সুদ ৮ টাকা দেয়ার পরও নিজের পকেট থেকে আরও ৪ টাকা গুণতে হচ্ছে! সবশেষে তার থাকলো ১০০ টাকায় মাত্র ৯৬ টাকা!! শতকরা ৪ টাকা **ক্ষতি**!!!

সুতরাং চিত্রটা দাঁড়ালো,

- ✓ শিল্পপতির দশ **লক্ষ** টাকা পুঁজিতে লাভ পঞ্চাশ **লক্ষ** টাকা|
- ✓ ব্যাংকের পুঁজি ছাড়া শুধুমাত্র আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের পর লাভ তিন **লক্ষ** ষাট হাজার টাকা টাকা|
- ✓ জনগণের নব্বই **লক্ষ** টাকা পুঁজিতে শতকরা ৪ টাকা ভর্তুকি| অর্থাৎ শতকরা লোকসান ৪ টাকা|

লক্ষ করুন, শিল্পপতি এক কোটি টাকায় মাত্র দশ **লক্ষ** টাকা খাটিয়ে পঞ্চাশ **লক্ষ** টাকা লাভ করল! ব্যাংক পুঁজিছাড়াই মুনাফা নিল তিন **লক্ষ** ষাট হাজার টাকা!! আর বেচারা জনগণ নব্বই **লক্ষ** টাকা পুঁজি থাকা **সত্ত্বেও** শতকরা ৪ টাকা ভর্তুকি!!!

আবার কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে যদি কারবারে লোকসান হয় তাহলে এ লোকসানের **ক্ষতিপূরণ** করিয়ে নেয়া হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্প ানির মাধ্যমে| আর ইন্স্যুরেন্স কোম্প ানীর কাছেও জমা থাকে এমন হাজার হাজার জনগণের টাকা যারা মাসে মাসে বা বছরে বছরে নিজের উপার্জনের একটা অংশ কোম্প ানিতে জমা করাতে থাকে| কিন্তু তাদের কোন

ব্যবসা কেন্দ্রে আগুনও লাগে না বা অন্য কোন দুর্ঘটনাও ঘটে না| এ কারণে সাধারণত তারা টাকা জমাই রাখে, উত্তোলনের সুযোগ হয় খুবই কম|

আবার এ ধরণের পুঁজিপতি যদি কোন বড় ধরণের ক্ষতির কারণে তারা ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে না পারে এবং এর পরিণামে ব্যাংক দেওলিয়া হয়ে যায়| তাহলে এ অবস্থায় পুঁজিপতিদের তো অল্প টাকা ক্ষতি হবে| বিপুল পরিমাণের ক্ষতি হবে সে সমস্ত আমানতকারীদের যাদের টাকা দিয়ে পুঁজিপতি কারবার পরিচালিত করেছে|

মোটকথা, এ সুদী ব্যবস্থার কারণে পুরো জাতির পুঁজি কতিপয় বড় পুঁজিপতি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে| আর তার বিনিময়ে জাতিকে প্রদান করে খুবই সামান্য অংশ| এ সামান্য অংশও দ্রব্যের উৎপাদন খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় তা সাধারণ ভোক্তাদের থেকেই উসূল করে নেয়| নিজের লোকসানের ক্ষতিপূরণও আদায় করে জনসাধারণের সঞ্চয় থেকে| এভাবে সুদের সামগ্রিক গতি এদিকে থাকে যে, জনগণের সঞ্চয়ের ব্যবসায়িক ফায়দা বেশির ভাগ বড় পুঁজিপতির কাছে পৌঁছে| আর সাধারণ জনগণ তার থেকে উপকৃত হয় সবচেয়ে কম| এভাবে সম্প দের গতিপ্রবাহ সবসময় উপরের দিকে অর্থাৎ বড় বড় পুঁজিপতির দিকেই থাকে|

এ কারণেই সুদের নীতিতে কখনোই সম্প দের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয় না; বরং ধনী ও গরীবের মাঝে তফাৎ বাড়তেই থাকে| তাই সুদের এই ভয়াবহ পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে হলে সুদ নামক বিষবৃক্ষটি উপড়ে ফেলতে হবে| তবেই আমরা সুদের এ অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে সক্ষম হবো| আল্লাহ আমাদের সব ধরনের হারাম থেকে বেঁচে হালাল গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন| আমীন|

তথ্যসূত্র:
*http://www.dailysangram.com
*দৈনিক ইত্তেফাক,১৯ অক্টোবর ২০১০, পৃ.১১
*সূত্র: দৈনিক সংগ্রাম, ২১ জুলাই ২০১৪

ইসলামী অর্থনীতিকে সুদ: পরিচিতি ও তাৎপর্য:

ইসলামী অর্থনীতিতে রিবার প্রায়োগিক অর্থ একাধিক। তাই পূর্ববর্তী ফকীহগণের অনেকেই রিবার গদবাধা কোনো সংজ্ঞা পেশ না করে সরাসরি এর প্রায়োগিক দিক ও প্রকার নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। অবশ্য একদল ফকীহ রিবার প্রায়োগিক দিক ও প্রকার ও আলোচনার পাশাপাশি এর একটি পরিচিতিও পেশ করেছেন। নিম্নে কিছু পেশ করা হলো:
ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া' এর লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল-মারগীনানী রহ. (মৃ. - ৫৯৩হি.) লিখেছেন, "রিবা হল, বিনিময়হীন এমন অতিরিক্ত অংশ, যা বিনিময়মূলক চুক্তিতে চুক্তিদ্বয়ের যে কেউ মূল চুক্তিতে শর্তের ভিত্তিতে প্রাপ্ত হয়"

মুহতী শফী রহ. বলেছেন, " শরীয়তের পরিভাষায় ওই অতিরিক্ত অর্থকে রিবা বলা হয়, যা আর্থিক লেনদেনে কোন বিনিময় ছাড়াই অর্জিত হয়"

ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত মুসলিম শাসক বাদশাহ মুহিউদ্দীন মুহাম্মাদ আলমগীর আওরংজের রহ. (মৃ. ১১১৮ হি.) এর অধীনে দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীতে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ প্রায় অর্ধশতাধিক ফকিহগণের সমন্বয়ে রচিত 'আলফাতাওয়াল হিন্দিয়া' গ্রন্থে রিবার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে,

"শরীয়তে রিবা হল, আর্থিক লেনদেনে বিনিময়হীন অতিরিক্ত সম্পদ"

বুঝা গেল, শরীয়তে রিবা হল, আর্থিক লেনদেনে শর্ত অতিরিক্ত প্রাপ্তির নাম, যা চুক্তিদ্বয়ের কোন একজন পেয়ে থাকে। এই 'অতিরিক্ত প্রাপ্তিটি' ব্যাপক। ক্রয়-বিক্রয়ে হতে পারে, ঋণের আদান-প্রদানেও হতে পারে।" এখানে সংক্ষেপে বলা হলো। এসাইনমেন্টে এত বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে কোন উস্তাযদের তত্ত্বাবধানে থেকে রিবার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার তাওফিক দান করেন। আমিন

রিবার তাৎপর্য:

রিবা শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বিশ্লেষণের পর এটি স্পস্ট যে, রিবার মূল কথা হল,

- একটি আর্থিক লেনদেন হতে হবে।
- সেই লেনফেনে পূর্ব শর্ত থাকবে।
- সেই শর্তের ভিত্তিতে বিনিময়হীন "বিশেষ অতিরিক্ত" কিছুর আদান-প্রদান করা হবে।

রিবা একটি শরঈ পরিভাষা, এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ শরীয়াহ থেকে জানতে হবে। যেমন নামাজ, যাকাত, হজ্জ এইগুলো প্রত্যকটি একেকটি শরঈ পরিভাষা। এসবের মর্ম উপলব্ধি

জন্য শরিয়তের দারস্থ হতে হবে। শুধু আভিধানিক বা মনগড়া ব্যাখ্যাও করা যাবে না। কুরয়ান, হাদিস, ফিকহে যে ব্যাখ্যা রয়েছে সেটাই গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি বলে, Interest just is cost of fund, nothing more, তাহলে সেটা স্রেফ মনগড়া পূজিবাদী বক্তব্য হবে। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

তাই ইন্টারেস্ট বা রিবা সুদ কাকে বলে, কোনটা ইন্টারেস্ট বা সুদ নয়, কোনটা ইন্টারেস্ট বা সুদ এইগুলো ইসলাম থেকেই জানতে হবে। সাধারণত ফিন্যান্স বা অর্থনৈতিক আলোকে একে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে খোলা মনে সব বোঝার তাওফিক দান করুক এবং আল্লাহর দেয়া সকল বিধিমালা মেনে চলার তাওফিক দান করুক। আমিন।

তথ্যসূত্র:

* বুরহানুদ্দীন মারগানানী, আলী ইবনে আবু বকর, (৫৯৩হি./১১৯৭ খ্রি.) আল-হিদায়া, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, বাংলাবাজার, ঢাকা, খ. ৩. পেইজ. ৭৮
* ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ, দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রকাশকাল: ২০১০ ইং. খ. ৩. পেইজ. ১১৮
* মুফতী শফী, মুহাম্মাদ শফী ইবনে ইয়াসিন আদ দেওবন্দী আল-উসমানী, মাসআলায়ে সুদ, ইদারাতুল মাআরিফ, করাচি, পেইজ. ১৫

রিবার প্রচলিত কয়েকটি রূপ

রিবা প্রধানত দুই প্রকার : ১. রিবা নাসিয়্যাহ ২. রিবাল ফযল; একে রিবাল বাইও বলা হয়।
এখানে আমরা শুধু রিবা নাসিয়্যাহর প্রচলিত কয়েকটি রূপ নিয়ে আলোচনা করব।

রিবা নাসিয়্যাহ

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. বলেন,
"এমন ঋণ যাতে মেয়াদ শর্ত করা হয় এবং গ্রহিতাকে অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত করা হয়।"
-আহকামুল কুরআন ১/৫৫৭

অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে কাউকে মেয়াদি ঋণ দেওয়া। একে রিবাল করযও বলা হয়। রিবান নাসিয়্যাহ-এর আরেক প্রকার হল, রিবাদ দাইন।

রিবাদ দাইন : কারো থেকে কোনো পণ্যের বিক্রিলব্ধ বকেয়া-মূল্য পরিশোধের সময় হলে তখন অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অর্থাৎ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শর্তে সময় বাড়িয়ে নেওয়া। জাহেলী যুগে রিবা নাসিয়্যাহর উভয় প্রকারের প্রচলন ছিল খুব বেশি।

রিবা আল-ফাযলের উদ্ভব হয় পণ্যসামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশী পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হ'লে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় রিবা আল-ফাযল। 'ফাযল' অর্থ অতিরিক্ত
আজও এই উভয় ধরনের রিবা নাসিয়্যাহ ব্যাংকিং জগতে এবং মার্চেন্টদের সমাজে বহুল প্রচলিত।
বাজারে বিভিন্ন পণ্য কিস্তিতে বিক্রি হয়। কিন্তু কিস্তি সময়মত দিতে না পারলে একটা নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়। এটা রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা বিলাল (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সমীপে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে হাযির হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমাদের খেজুর নিকৃষ্টমানের ছিল। আমি তার দুই ছা'-এর বিনিময়ে এক ছা' উন্নতমানের 'বারমী' খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলল ' 'ওহ! এতো নির্ভেজাল সূদ, এতো নির্ভেজাল সূদ। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহ'লে নিজের খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর উন্নতমানের খেজুর কিনে নিবে'।

অন্য এক হাদীছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

"সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে হাতে হাতে। যে ব্যক্তি বেশী দিয়েছে বা নিয়েছে সে সূদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান"।

তাই ইসলামে এই ধরনের লেনদেন তথা রিবা নিষিদ্ধ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হ'ল, তাৎক্ষণিক স্থানীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষে সুবিচার ও যথাযথ বিনিময় সম্ভব নাও হ'তে পারে। তাই শরী'আতের হুকুম হ'ল নির্ধারিত পণ্যটি প্রথমে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হবে।

রিবা নাসিয়্যাহর প্রচলিত রূপ ও ক্ষেত্রসমূহ

রিবা নাসিয়্যাহকে রিবাল কুরআন, রিবাল করয ও রিবাদ দাইনও বলা হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং সুদ এর জ্বলন্ত উদাহরণ, এছাড়াও আরো ক্ষেত্র আছে, নিম্নে একেকটি করে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল:

১. সুদী ব্যাংক : ব্যাংকের সংজ্ঞাতেই আছে যে, ব্যাংক হল, অল্প সুদে ঋণ নেয়, আর বেশী সুদে ঋণ দেয়। সুদী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট ছাড়া সকল প্রকার একাউন্ট সুদী একাউন্ট। তাই সুদী ব্যাংকের সেভিং একাউন্ট এবং সকল ধরনের ফিক্সড ডিপোজিট সুদী। চাই তা উচঝ হোক বা ঋউজ হোক অথবা সাধারণ ফিক্সড ডিপোজিট হোক; সবই রিবা নাসিয়্যাহ একাউন্ট। অনেকে মনে করেন সরকারী হলে সেটা আর সুদী হয় না। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।
এছাড়া কারেন্ট একাউন্টেও ইদানিং সুদের মিশ্রণ দেওয়া হয়। এ ধরনের কারেন্ট একাউন্টকে SND কারেন্ট একাউন্ট বলে। এসকল একাউন্ট খোলাই সুদী চুক্তির গুনাহ। পরে সুদ গ্রহণ করলে তার গুনাহ ভিন্ন হবে।
সুদী ব্যাংকের সেভিং একাউন্ট খোলাটাই সুদী চুক্তির গুনাহ। তাই সুদ গ্রহণ না করলেও যে কোনো ধরনের সেভিং একাউন্ট করলে সুদী চুক্তির গুনাহ হবে।

২. ডি. পি. এস/ DPS ডিপোজিট পেনশন স্কীম : এটিও সম্পূর্ণ সুদী একাউন্ট।

৩. সুদী ব্যাংকের যে কোনো লোনই সুদী লোন। যেমন কার লোন, হোম লোন, হাউজ লোন, ইনভেস্টমেন্ট লোন, সিসি লোন, কৃষি লোন ইত্যাদি।

৪. প্রাইজবন্ড : সরকার প্রাইজবন্ড ছাড়ে। যা যে কোনো ব্যাংক থেকে ভাঙ্গানো যায়। একটা নির্ধারিত মেয়াদের পর লটারীর মাধ্যমে ড্র করা হয়। এরপর বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটাই রিবা নাসিয়্যাহ বা সুদ। প্রাইজবন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংককে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। আর ব্যাংক প্রাইজ বা পুরস্কার দেয়ার নামে ক্রেতাকে সুদ দিচ্ছে।

৫. ক্রেডিট কার্ড : ক্রেডিট কার্ড মূলত এক প্রকার সুদভিত্তিক লোন কার্ড। কেননা এই কার্ডের চুক্তিপত্রেই লেখা রয়েছে যে, মিনিমাম ডিউ টাইমে/ডেটে বাকী পরিশোধ না করলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হবে। যার ফলে অধিকাংশ ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারই সুদের আওতায় পড়ে যান। এই সুদ রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত, যা রিবা নাসিয়্যাহ। তাই সুদ থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই যথাসময়ে বাকী পরিশোধ করে দিতে হবে। তাহলে আর সুদী কারবার হবে না।

৬. ক্রেডিট কার্ড দ্বারা এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন করলে যে চার্জ নেওয়া হয় তা সুস্পষ্ট সুদ। কেননা কার্ডের ফি তো নিচ্ছেই। এখন অতিরিক্তটা ঋণের বিনিময়ে হচ্ছে।

৭. বন্ড : সরকারী এবং বেসরকারী বন্ড। এগুলো সম্পূর্ণ রিবা নাসিয়্যাহ। সরকারী হওয়ার কারণে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো বাণিজ্যিক প্রকল্প, কোনো কোম্পানী বা রাস্তা-ঘাট কিংবা ব্রীজ নির্মাণের জন্য ঋণ নেওয়া হচ্ছে এমন কথা উল্লেখ করার কারণে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এটা সুদী হবে না, কিন্তু এ ধারণা ভুল। স্টক এক্সচেঞ্জ বা বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্য যে কোনো ব্যাংকে যে বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয় তাতে সুনির্দিষ্ট সুদের ঘোষণা দেওয়া থাকে। এ সকল বন্ডও সুদী বন্ড।
৮. স্টুডেন্ট লোন : বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক স্টুডেন্ট লোন দিয়ে যা অতিরিক্ত নেওয়া হয় সেটাও সুদ। এটি ইন্টারেস্ট বা সার্ভিস চার্জ যে নামেই নেওয়া হোক না কেন।

৯. লটারী : রেডক্রিসেন্ট বা এজাতীয় সরকার অনুমোদিত কিছু প্রতিষ্ঠান দশটাকা বিশটাকা মূল্যের লটারী টিকেট ছাড়ে। এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকা, গাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা নেয়া হয়।
এক্ষেত্রে পুরস্কার পায় কেবল দু্তিনজন। আর বাকিরা কিছুই পায় না। তাদের মূল টাকাই গচ্চা যায়। এধরনের লেনদেনকেই শরীয়তের ভাষায় 'কিমার' বলে। যা সম্পূর্ণ হারাম। আর এক্ষেত্রে সবাই তো অতিরিক্ত পাওয়ার উদ্দেশ্যেই দশ-বিশ টাকায় লটারি ক্রয় করে থাকে। যদিও কেউ পুরস্কার পায় আর কেউ পায়া না। তাই এতে সুদও বিদ্যমান।

১০. পোস্ট অফিসের সঞ্চয়পত্র : পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সরকারীভাবে বিভিন্ন নামের সঞ্চয়পত্র স্কীম রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সুদী, রিবা নাসিয়্যাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

১১. জমি বন্ধক : বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় বহুল প্রচলিত লেনদেন হল, জমি বন্ধক রীতি। জমির মালিক একটা মোটা অংকের টাকা নেয়। বিনিময়ে বন্ধক গ্রহীতা জমিটি ভোগ করে এবং মেয়াদান্তে মালিক পুরো টাকা ফেরত দিয়ে জমিটি বুঝে নেয়। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার জন্য বন্ধকি জমি ভোগ করা রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। কোনো কোনো এলাকায় এটাকে জমি কট দেওয়াও বলে। আবার কেউ জমি খায়খালাসি দেওয়া বলে। নাম যাই হোক লেনদেন এবং হুকুম একই।

১২. বাড়ি বন্ধক : জমি বন্ধকের মত ঢাকা শহরে বাড়ি বন্ধকের প্রথা চালু হয়েছে। তা হল, বাড়িওয়ালা নিজ প্রয়োজনে ৫ বা ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়। বিনিময়ে পাঁচ বছর বা দশ বছর ঋণদাতাকে তার ফ্ল্যাটে বিনা ভাড়ায় থাকার সুযোগ দেয়। পরবর্তীতে যখন ঋণ পরিশোধ করে দিবে তখন এই চুক্তি সমাপ্ত হবে। এই লেনদেনও সম্পূর্ণ সুদী ও রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। যা সুস্পষ্ট হারাম। কেননা ঋণের কারণেই এ সুবিধা পাচ্ছে।

১৩. বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে সিকিউরিটি বেশি দিলে ভাড়া কমিয়ে দেওয়া : বাড়ি বন্ধকের উপরোক্ত পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার কারণে অনেকে হীলা হিসাবে এ পদ্ধতি চালু করেছে। যেমন, কোনো বাড়িওয়ালার টাকার প্রয়োজন । যেখানে সাধারণ হিসেবে অগ্রিম নেয়ার কথা ২০ হাজার টাকা, কিন্তু এর স্থলে বাড়িওয়ালা পাঁচ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি মানি দাবি করে এবং এর বিনিময়ে ভাড়া কমিয়ে দেয় (যেমন, সাধারণ হিসেবে ভাড়া যদি হয় ১০ হাজার টাকা এক্ষেত্রে ভাড়া হবে ১/২ হাজার টাকা)- এটাও হারাম। কেননা ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই মূলত তার থেকে ভাড়া কম নিচ্ছে। এই ঋণকে ছুতা হিসেবে সিকিউরিটি মানি বলা হয়েছে। মূলত সিকিউরিটি মানি তো সেটাই যা সচরাচর সবাই দিয়ে থাকে। যা দিলে ভাড়া কমানো হয় না। ভাড়া স্বাভাবিকই থাকে। নাম যাই দেওয়া হোক ফেরতযোগ্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই ১০ হাজার টাকার ভাড়া ১/২ হাজারে নেমে এসেছে।
ফাযালা বিন উবাইদ রা. বলেন, যেই ঋণ কোনো মুনাফা নিয়ে আসে তা রিবার প্রকারসমূহের একটি। -সুনানে বাইহাকী ৫/৩৫০
ইমাম মালেক রাহ. বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বস্তু ঋণ দিবে সে যেন অতিরিক্ত কোনো কিছু শর্ত না করে। যদিও এক মুঠো ঘাস হোক না কেন। -মুআত্তা মালেক, হাদীস ২৫১৩

১৪. ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড : সরকারী বা বেসরকারী ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড সুদী ফান্ড। ঐচ্ছিক হওয়ার কারণে এতে টাকা জমা দেওয়ার অর্থ ঋণ দিয়ে পরবর্তীতে অতিরিক্ত নেওয়া। আর এটাই রিবা নাসিয়্যাহ। আর পুরো সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডের বাধ্যতামূলক যে অংশ এই ফান্ডে কেটে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এর সাথে অতিরিক্ত যে অংশ দেওয়া হয় তা সুদ নয়। তা নেওয়া জায়েয। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক কেটে রাখার পাশাপাশি ঐচ্ছিকও কিছু কাটানোর সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকের অতিরিক্ত অংশ কাটানো সুদী চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এই অতিরিক্ত কর্তিত অংশের উপর উদ্‌বৃত্ত যা দিবে তা সুদ। তা নেওয়া বৈধ হবে না। তাই বাধ্যতামূলকের অতিরিক্ত উক্ত ফান্ডে জমা রাখাও জায়েয হবে না। কেননা ঐচ্ছিক অংশ রাখার অর্থই হল সুদী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এছাড়া স্বায়ত্ত¡শাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সকল টাকা সুদী ব্যাংক বা বীমাতে রেখে বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে সেটিই তাদেরকে দেওয়া হয়। তাই এসকল প্রতিষ্ঠানের ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমার অতিরিক্ত নেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা সেগুলোও সুদের অন্তর্ভুক্ত।

১৫. লাভের হার নির্ধারণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা প্রদানের শর্তে বিনিয়োগ করা: ব্যাংক ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার জন্য টাকা প্রদান করে লাভ হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার শর্ত করা হয় এটাও সম্পূর্ণ সুদী লেনদেন ও সুদী বিনিয়োগ। ব্যবসার জন্য দেওয়া আর লাভ দেওয়ার কথা হলেই অনেকে মনে করেন তা ইসলামী হয়ে যায়; সুদী থাকে না। অথচ ব্যবসার জন্য টাকা দিয়ে নির্ধারিত অংকের কিছু দেওয়ার চুক্তি বা শর্ত করাই সুদ ও রিবা নাসিয়্যাহ। এক্ষেত্রে হালালভাবে বিনিয়োগ করতে চাইলে ব্যবসার প্রকৃত লাভের শতকরা হার নির্ধারণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে লাভ হলে নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী ভাগ পাবে। আর লাভ না হলে পাবে না।
কিন্তু পূর্বোক্ত লেনদেনে লাভ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু দেওয়ার কথা হলে চুক্তি অনুযায়ী সে তা দিতে বাধ্য থাকে। লাভ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তাকে তা দিতেই হয়। এটাই সুদ। তদ্রূপ কোনো কিছু নির্দিষ্ট না করে এমনিতেই ব্যবসার জন্য কাউকে টাকা দেওয়া। এক্ষেত্রে কথা হয় যে, লাভ হিসেবে প্রতিমাসে কিছু কিছু দিবে। এটাও সুদী চুক্তি এবং রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত।

১৬. জুয়েলারী দোকানে স্বর্ণ বন্ধক রেখে সুদের উপর লোন প্রদান করা হয়। তেমনিভাবে ব্রাক, আশা, গ্রামের মহাজন সুদের ভিত্তিতে লোকদেরকে লোন দিয়ে থাকে। এগুলো সবই রিবা নাসিয়্যাহ।

১৭. ফরম বিক্রির ছুতায় রিবা নাসিয়্যাহ : কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটি মানুষকে সুদবিহীন লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের নিয়ম হল, ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী ফরম কিনতে বাধ্য করা হয় আর ঋণের হার অনুযায়ী ফরমের দাম কম-বেশি হয়। যেমন, দশ হাজার টাকা ঋণের জন্য পাঁচশত টাকার ফরম ক্রয় করতে হয়। আর বিশ হাজার টাকার জন্য এক হাজার টাকার ফরম ক্রয় করতে হয় । আর নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর তা পরিশোধ না করলে পরে আবারও আরেকটি ফরম ক্রয় করে পূরণ করতে হয়। বাহ্যিকভাবে এটি ফরম ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু এর মাধ্যমেই সুদ অগ্রীম আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। এজন্যই ঋণের পরিমাণ বাড়লে ফরমের মূল্যও বাড়তে থাকে। এটা হচ্ছে রিবা নাসিয়্যাহ গ্রহণের হীলা-বাহানা ও ছুতা অবলম্বন।

১৮. কিস্তি-বিক্রি : বাজারে ফ্রিজ, কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী কিস্তিতে বিক্রি হয়। এই বিক্রির চুক্তিপত্রের মধ্যেই উল্লেখ থাকে সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে একটা নির্দিষ্ট হারে সুদ বাড়বে। এটা রিবাদ দাইন ও রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের শর্ত সম্পূর্ণ নাজায়েয। আর বাধ্য হয়ে কেউ এধরনের শর্তে ক্রয় করলে নির্ধারিত মেয়াদের ভেতরই কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। নতুবা সুদ দেওয়ার গুনাহ হবে। অতএব এ ধরনের ক্ষেত্রে সুদ থেকে বাঁচতে চাইলে যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে।

১৯. ইনস্টাবাই : Instabuy বিভিন্ন কোম্পানী ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারকে বিনা সুদে এবং অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া ২/৩ বা ১২ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সুদ দিতে হয়। এতে কারবারটি সুদী কারবারে পরিণত হয়ে যায়। তাই ইনস্টাবাই-এর সুবিধা গ্রহণ করলেও যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় কারবার সুদী হয়ে যাবে। অর্থাৎ রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

তথ্যসূত্রঃ

***https://www.alkawsar.com/bn/article/1349/**

* https://ahlehadeethbd.org/online_books/Sud%20Bangla/5.html

সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল

সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল নিম্নে সংক্ষেপে দেয়া হলো। এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত পড়ার দাবি রাখে। এখানে অল্প আকারে শুধু পয়েন্টগুলো তুলে ধরার চেস্টা করা হলো

১)সমাজে শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সুদ। একদল লোক বিনা শ্রমে অন্যের কষ্টার্জিত উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা নেয়, সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক, তাকে সুদের অর্থ পরিশোধ করতেই হয়।
২)সুদের কারণে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে, গরিবেরা গরিব হতে হতে একপর্যায়ে চরম অসহায়ত্বের পর্যায়ে চলে যায়। এর ফলে অনেকে আত্মহত্যা কিংবা বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।
৩)সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য তথা উৎপাদন খরচ, পরিবহন খরচ, শুল্ক ও স্বাভাবিক মুনাফার ওপর উপর্যুপরি সুদ যোগ হতে থাকে। এর ফলে দ্রব্যমূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। গত শতকের চল্লিশ দশকে জার্মান বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ "জোসেফ শাখত" সুদ নিয়ে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন।সেখানে তিনি লিখেছেন - সুদের নিশ্চিত ফলাফল হলো,স্বল্প কিছু ব্যক্তির হাতে অর্থ বৃদ্ধি পাবে,যাদের সংখ্যা ধারাবাহিক কমতে থাকবে।বহু মানুষ দরিদ্র হবে,যার সংখ্যা ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতির সুফল

ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হচ্ছে, পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘ধন-ঐশ্বর্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।’ (সুরা হাশর: ৭) কিন্তু সুদের ফলে পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে একশ্রেণির মানুষের সম্পদ বিনা শ্রমে, বিনা উৎপাদনে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আরেক দিকে গরিব মানুষেরা প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য অমানুষিক শ্রম সত্ত্বেও দিন দিন আরও গরিব হতে থাকে।ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক, অনুরূপভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক । অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন না হয় এর জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে । গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে । এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী,

মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনোরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই। মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রে এর বাস্তবতা দেখা যায়। যে আরবের অধিবাসীরা একসময় বৈষম্য ও দারিদ্রের শিকার ছিল, ইসলামি অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যেত না।

সাধারণ কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১/ প্রশ্ন: সুদ কে কেন হারাম করা হল?

উত্তর: সুদকে আল্লাহ এ কারণেই হারাম করেছেন যে, এর মাধ্যমে অভাবীদের অভাবকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো হয়, একজন গরিব লোকের ওপর অধিকহারে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও সমাজে সুদের প্রচলনের কারণে পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, বিশৃংখলা, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, খুন-খারাবি ব্যাপকহারে সংঘটিত হয়। সুদের প্রচলনের কারণে মানুষ কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়। তারা সুদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে তারা জমিনে ফসল ফলানোর জন্য কোনো পরিশ্রমকরে না। এসব ছাড়াও সুদের রয়েছে আরো অনেক ক্ষতিকারিতা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন: “যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসরকরে মোহবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে: ক্রয়-বিক্রয় তো সুদ নেয়ার মতই। অথচ আল্লাহ তা’আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপর আল্লাহর উপর নির্ভশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযথে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহপাক সুদকে নিশ্চহ্ন করেন এবয দান খায়রাতকেবর্ধিত করেন। আল্লাজ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।” (সূরা বাকারাহ: ২৭৫-২৭৬)

২/ প্রশ্ন: যারা সুদ খায় তাদের পরিণাম কি হবে? সুদী ব্যাংকে চাকরী করা যাবে কি?

উত্তর: যারা সুদ খেয়েছে তাদের তাওবা করে তা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে:

“হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক। অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।” (সূরা বাকারাহ: ২৭৮-২৭৯)

সুদী ব্যাংকে চাকরী করাও হারাম। যারা সুদ খায় তাদের যায়গা জাহান্নাম। তাছাড়া রাসূল (স:) সুদের সম্পৃক্ত চার প্রকারের লোককে অভিসম্পাত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবেনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“রাসূল (স:) সুদগ্রহীতাকে, সুদদাতাকে, সাক্ষীদাতাকে এবং লেখকে অভিসম্পাত করেছেন” (হাদীসসহীহ/ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)
উপরোক্ত হাদিস মতে সুদী ব্যাংকে চাকরী করা হারাম। আল্লাহ(সুব.) আমাদেরকে সত্য মেনে নেয়ার তাওফিক দিন-আমীন।

৩/ প্রশ্ন: যারা ব্যাংকে চাকুরী করে, নিজে পরিশ্রম করে খেটে কাজ করে, তাদের টাকা হারাম কেনো হবে?

উত্তর: চোর, ডাকাত তারাও তো পরিশ্রম করে ইনকাম করে, তাহলে তাদেরটা হারাম হবে কেন?

৪/ প্রশ্ন: সুদের ওপর টাকা নিয়ে বিদেশ গিয়ে চাকরি করে টাকা-পয়সা কামালে সে টাকা হালাল হবে কি? সে টাকায় হজ করলে হজ আদায় হবে?
উত্তর: সুদ নেওয়া এবং দেওয়া উভয়টাই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ সুদের ওপর টাকা নিয়ে বিদেশ গিয়ে হালালভাবে টাকা উপার্জন করে তাহলে তার উপার্জিত টাকা হালাল হবে। আর ওই সফরে হজ করলে হজও আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের ওপর টাকা নেওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। (মুসলিম, হাদিস : ১৫৯৮, নিজামুল ফাতাওয়া : ১/১৮৯y)

৫/ প্রশ্ন: সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল কি কি?

উত্তর: ১)সমাজে শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সুদ। একদল লোক বিনা শ্রমে অন্যের কষ্টার্জিত উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা নেয়, সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক, তাকে সুদের অর্থ পরিশোধ করতেই হয়।

২)সুদের কারণে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে, গরিবেরা গরিব হতে হতে একপর্যায়ে চরম অসহায়ত্বের পর্যায়ে চলে যায়। এর ফলে অনেকে আত্মহত্যা কিংবা বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।
৩)সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য তথা উৎপাদন খরচ, পরিবহন খরচ, শুল্ক ও স্বাভাবিক মুনাফার ওপর উপর্যুপরি সুদ যোগ হতে থাকে। এর ফলে দ্রব্যমূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। গত শতকের চল্লিশ দশকে জার্মান বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ "জোসেফ শাখত" সুদ নিয়ে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন।সেখানে তিনি লিখেছেন - সুদের নিশ্চিত ফলাফল হলো,স্বল্প কিছু ব্যক্তির হাতে অর্থ বৃদ্ধি পাবে,যাদের সংখ্যা ধারাবাহিক কমতে থাকবে।বহু মানুষ দরিদ্র হবে,যার সংখ্যা ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

৬/ প্রশ্ন: সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতির সুফল কি?

উত্তর: ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হচ্ছে, পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘ধন-ঐশ্বর্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।’ (সুরা হাশর: ৭) কিন্তু সুদের ফলে পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে একশ্রেণির মানুষের সম্পদ বিনা শ্রমে, বিনা উৎপাদনে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আরেক দিকে গরিব মানুষেরা প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য অমানুষিক শ্রম সত্ত্বেও দিন দিন আরও গরিব হতে থাকে।ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক, অনুরূপভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক । অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন না হয় এর জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে । গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে । এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে । বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনোরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই । মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রে এর বাস্তবতা দেখা যায় । যে আরবের অধিবাসীরা একসময় বৈষম্য ও দারিদ্রের শিকার ছিল, ইসলামি অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যেত না ।

৭/ প্রশ্ন: নারী- পুরুষ সবাই সমান, তাহলে ২ নারীর সাক্ষ্য ১ পুরুষের সমান কেনো?

উত্তর: কোরআনে ৫টি আয়াতে (৫:১০৬,৬৫:২,২৪:২,৬) নারী-পুরুষের সাক্ষ্য এর ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয় নি শুধুমাত্র একটি আয়াতে পার্থক্য এর বিষয় এসেছে (২:২৮২)..

.

ইসলামে সম্পদের লেনদেনের আয়াতে (২ঃ২৮২) ইসলাম শুধু সমাজে এই পার্থক্য সমাজে পুরুষের দায়িত্বের পার্থক্য এত জন্য করা হয়েছে। পুরুষের দায়িত্ব বাবা মা,ভাই বোন,সন্তান, স্ত্রী সব বেশি নারীর তুলনায় অনেক বেশি, যা উত্তরাধিকার এর প্রশ্নে (৩ নাম্বারে) আরো বিস্তারিত বোঝা যাবে।

এই আয়াতটি ইসলামে সম্পদের লেনদেন সম্পর্কিত আয়াত যা সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্য এর কারণে এসেছে।

* নারীর একক সাক্ষী অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য:

১। আয়েশা রা: এর মতে, একক সাক্ষী হাদিসের বিশুদ্ধতায় গ্রহণযোগ্য

২। চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন নারীর সাক্ষ্যই যথেস্ট

৩। নারীদের ব্যক্তিগত মাশায়ালার ক্ষেত্রে

৪। মহিলার মৃতদেহ গোসলের ক্ষেত্রে

৮/ প্রশ্ন: উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিবা মিরাযের ক্ষেত্রে

ইসলামী আইনে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেনো?
উত্তর: ইসলামে নারীর ওপর কোন অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্ব নেই, যা ন্যস্ত আছে পুরুষের কাঁধে। বিয়ের আগে নারীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সব কিছুর দায়িত্ব থাকে পিতা ও ভাইদের ওপর। বিয়ের পরে উপরিউক্ত দায়িত্ব বর্তায় স্বামী ও ছেলেদের ওপর। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। এসব দায়দায়িত্ব পূরণ তাকে যোগ্য করে তোলার জন্য তাকে উওরাধিকারের অংশও দ্বিগুণ করে দেয়া হয়েছে।

যেমন: এক লোক এক মেয়ে ও ছেলে রেখে ইন্তেকাল করলো, সাথে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা রেখে। এ অবস্থায় ছেলে পাবে ১ লাখ আর মেয়ে পাবে ৫০ হাজার। কিন্তু যেহেতু পুত্রের ওপর সংসারের সর্বপ্রকার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব আছে তাই ব্যয়ের পর দেখা গেলো পুত্রের ৮০ হাজার খরচ হওয়ার পর রইলো ২০ হাজার টাকা। আর মেয়ের কোন দায়িত্ব না থাকার গচ্ছিত রইলো ৫০ হাজার টাকা। এখন আপনাকে যদি কেউ ১ লাখ টাকা হাতে দিয়ে বলে ৮০ হাজার খরচ হয়ে যাবে এবং বাকি থাকবে ২০ হাজার টাকা, অপরদিকে ৫০ হাজার টাকা যার একটি টাকাও

খরচ হবে না। তাহলে আপনি কোনটা নিবেন? সেক্ষেত্রে কোন বোকাও কিন্তু ১ লাখ টাকা নিতে চাইবে না।

৯ / প্রশ্ন: মুসলমানদের অধিক হারে মৌলবাদী ও একমুখী দেখা যায় কেনো?
উত্তর: মৌলবাদী (Fundamentalist) শব্দের উৎপত্তি:

ওয়েবস্টার এর ইংরেজি ডিকশনারী অনুযায়ী fundamentalism ছিল এমন এক আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রোটেস্টেন্টরা আরম্ভ করে। "মৌলবাদ" এমন এক পরিভাষা যা প্রথমে খ্রিস্টানদের একদল সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় যারা বিশ্বাস করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি অক্ষর আল্লাহর বানী এবং এর মধ্যে কোন কম বেশি/ভুল নেই। কিন্তু অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী মৌলবাদ হলো এমন কোন বিশেষ ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামের মূল বা ভিত্তির ওপর আমল করা।

পশ্চিমা পন্ডিতগণ এবং তাদের মিডিয়াগুলো মৌলবাদের অভিযোগ থেকে খ্রিস্টানদের অব্যাহতি দিয়ে মুসলমানদের ওপর বিশেষভাবে এ অভিযোগ চাপাচ্ছে৷ আজ মৌলবাদ পরিভাষা যখনই ব্যবহৃত হয় তখনই ব্যবহারকারীর মগজে তৎক্ষণাৎ এমন এক মুসলমানের চিত্র ভেসে ওঠে যে এদের দৃস্টিতে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠাবান এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে তার আকিদাকে প্রচার করে।

ইসলামে মৌলবাদী ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি নিজ বিশ্বাস বা দৃস্টিভংগির দ্বারা মূল কথাগুলোকে সবচেয়ে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে ও তার ওপর আমল করে। যেমন একজন ডাক্তারকে তার মৌলিক কথাগুলোর ওপর জ্ঞানার্জন ও তার ওপর আমলের নিষ্ঠাও থাকতে হবে, ব্যাপারটা তেমন।

তাই মৌলবাদী হওয়া গৌরবের বিষয় এবং সকল মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া জরুরী।

১০/ প্রশ্ন: মুসলমান এক কোরআনকে অনুসরণ করে। এরপরও তাদের চিন্তা-ভাবনায় মধ্যে এত পার্থক্য কেন? এও বলতে পারি যে, ইসলামে এত ফিরকা বা দল কেনো?

উত্তর: ইসলাম নিজ অনুসারীদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার ওপর বিশ্বাস করে।

"...তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।" (আল ইমরান ৩:১০৩)

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের..." (নিসা ৪:৫৯)

এই দুই আয়াতে স্পস্টভাবে বলা হয়েছে আমাদের করণীয়।

"ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (আল ইমরান ৩:৬৭)

এখানে ইব্রাহিম আ: এর পরিচয় একজন মুসলিম হিসেবে দেয়া হয়েছে। কোন দলাদলি এখানে আসে নি।

"আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?" (সূরা হা মীম সিজদাহ ৪১:৩৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭ হিজরীতে অমুসলিম শাসকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন যার শব্দাবলি আল ইমরানে এসেছে: "তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম"

কোরয়ানে নবীরা বার বার পরিচয় দিচ্ছেন আমরা মুসলমান। আমাদের পরিচয় আমরা মুসলিম।

নবীজী (সা:) বলেছেন,

"...আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।" (তিরমীযি: ২৬৪১)

যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে এর অধ্যয়ন করে এবং বিশুদ্ধ হাদিসের ওপর আমল করে তবে ইন শা আল্লাহ সকল মতানৈক্য শেষ হয়ে যাবে এবং মুসলমানগণ এক ঐক্যমতের উম্মত হয়ে যাবে।

১১/ প্রশ্ন: মুহাম্মাদ (সা) অর্ধচেতন (!)এবং কুরআন কি অজ্ঞাতসারে রচিত হয়েছে?এটা কি তিঁনি অন্য কোনো ধর্ম থেকে নকল করেছেন? বা অন্য কোনো ব্যক্তির উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন কি না?

উত্তর: যদি কোনো মানুষ এ ধরনের মনোরোগে আক্রান্ত বা বিকৃত মস্তিকের হয় তাহলে সে জানতে অক্ষম হবে যে-কুরআন সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়েছে।কুরআন একসাথে নাযিল হয়নি। এটা ২৩ বছরে খন্ড খন্ড করে স্তরে স্তরে নাযিল হয়েছে।কুরআন যদি কোনো অর্ধচেতন বা বিকৃতমস্তিষ্ক মন থেকে আসতো তাহলে এত সুশৃঙ্খলভাবে বজায় থাকতো না।একজন লোকের দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির উপর থাকা সম্ভব না, যেখানে তিনি এ দীর্ঘসময় অর্ধচেতন থাকবেন।

তথ্যসূত্র:
*সূরা ক্বলাম: আয়াত নং ২

*সূরা তাকউইক: আয়াত নং ২২

* সূরা আনকাবুত: আয়াত নং ৪৮

১২/ প্রশ্ন: কেন মুসলমানরা খোদাকে "আল্লাহ" বলে?

উত্তর: সুরা ইখলাসে বলা হয়েছে "বলুন,তিনিই আল্লাহ,এক এবং একক।আল্লাহ অদ্বিতীয়, অনন্ত।তিনি কাউকে জন্ম দেননি।কারো দ্বারা জন্মগ্রহণ ও করেন নি।এ পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। God ইংরেজি শব্দ,খাঁটি আরবি শব্দ আল্লাহ।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই। God এর সাথে S যুক্ত করলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হবে,কিন্তু আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই।God এর সাথে ess যুক্ত করলে Godess অর্থাৎ নারী হবে। আল্লাহর নারী-পুরুষ বলতে কিছু নেই।আল্লাহর লিঙ্গভেদ নেই।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই।বড় হাতের God লেখলে হবে সত্যিকার,ছোট হাতের god লেখলে হবে নকল খোদা।God এর সাথে father যুক্ত করলে হবে godfather.আল্লাহর সাথে আব্বা কিংবা ফাদার যুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই।god এর সাথে mother যুক্ত করলে হবে godmother.আল্লাহর সাথে 'মাদার'বা 'আম্মি আল্লাহ'বলতে কিছু নেই।God এর পূর্বে টিন যুক্ত করলে হয় 'টিনগড' অর্থাৎ বাতিল গড।ইসলামে টিন আল্লাহ বলতে কিছু নেই। আল্লাহ খাঁটি এবং একক।

তথ্যসূত্র:
*সুরা ইখলাস,

*সূরা আল-ইসরা: আয়াত নং ১১০

,*সূরা আরাফ: আয়াত নং ১৮০

,*সূরা হাশর: আয়াত নং ২৪,

*সূরা ত্বহা: আয়াত নং ৮

১৩/ প্রশ্ন: সমাজই কি একজন ছেলেকে ছেলে এবং একজন মেয়েকে মেয়েতে পরিনত করে?

উত্তর: বর্তমান সমাজের বড় ফিতনা ট্রান্সজেন্ডার। তাদের একটি বক্তব্য হলো; সমাজই সন্তানকে ছেলে মেয়েতে পরিণত করে। অথচ সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে নির্ধারণ হয় গর্ভকালীন সময়ে। তাছাড়া এক্স ওয়াই ক্রোমোজোমের কথাও আমাদের অজানা নয়।

ছেলে মেয়ের শারীরিক গঠনগত যে পার্থক্যগুলো রয়েছে তা তৈরি হয় গর্ভের 40 দিন পর বা এর কাছাকাছি সময়ে।

বিজ্ঞানের আলোকে: চল্লিশ দিন সময়ের পর বিভিন্ন হরমোনের কারণে সন্তানের শারীরিক পরিবর্তন হয়; তখনই সন্তান ছেলে বা মেয়েতে পরিণত হয়।

আল্লাহ বলেন: সন্তান মাতৃগর্ভে বীর্যের আকারে ৪০ দিন, জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়ে ৪০ দিন, গোশত আকারে ৪০ দিন থাকে। (১)

হাদিসে এসেছে: 'আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করেন। ফেরেশতা বলেন, হে রব! এখনো তো ভ্রূণ মাত্র। হে রব! এখন জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। হে রব! এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যদি তাকে সৃষ্টি করতে চান, তখন ফেরেশতাটি বলেন, হে আমার রব! (সন্তানটি) ছেলে না মেয়ে হবে, পাপী না নেককার, রিজক কী পরিমাণ ও আয়ুষ্কাল কত হবে? অতএব, এভাবে তার তাকদির মাতৃগর্ভে লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়। (২)

সুতরাং ট্রান্সজেন্ডারদের যে বক্তব্য সমাজই ছেলেমেয়ে বানায়, তা সম্পূর্ণই অযৌক্তিক

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতম গঠনে (৩)
এতে যারাই পরিবর্তন করতে চাইবে তারাই অভিশপ্ত (৪

)

তথ্যসূত্র:
১. বুখারি, হাদিস: ২৯৬৮

২. বুখারি, হাদিস: ৩০৮৭

৩. সুরা ত্বিন:আয়াত ৪

৪. তিরমিজি, হাদিস : ২৭৮৫

১৪/ প্রশ্ন: বিজ্ঞানের আলোকে মৌমাছি vs কুরআন

উত্তর: আমরা জানতাম মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে বিভিন্ন ফুল থেকে অতঃপর তা মৌচাকে মজুদ করে রাখে সরাসরি।

কিন্তু বিজ্ঞান কিছুদিন আগে প্রমাণ করেছে মৌমাছির শরীর থেকেই মধু বের হয়।

আর কুরআন প্রায় সাড়ে ১৪ শ' বছর আগেই বলে দিয়েছে যে, মধু মৌমাছির শরীর থেকে বের হয়।

কুরআনে আছে: "আপনার পালনকর্তা মধু মক্ষিকাকে আদেশ দিলেন: পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরি কর। এরপর সব প্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার।" (১)

আর বিজ্ঞান এও আবিষ্কার করেছে যে, শ্রমিক মৌমাছিরা স্ত্রী জাতীয় এবং তারা রাণীর কাছে জবাবদিহী করে

অধিকন্তু; উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত ক্রিয়াপদে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ (اسلکی ، کلی) "চল" ও "খাও" এগুলো স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে।

এর দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, খাদ্যের অন্বেষণে বাসা ত্যাগকারী মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি।

তথ্যসূত্র:
সূরা নাহল:আয়াত ৬৮,৬৯

১৫/ প্রশ্ন: মাঠি দ্বারা তায়াম্মুম করলে কি শরীর পরিষ্কার হয়? বিজ্ঞান কী বলে?

উত্তর: বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে, মাঠির পরিষ্কার করার গুন রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাবানের চেয়ে মাটি দিয়ে গোসল করা বেশি উপকারী। কারণ মাটিতে আছে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ ও খনিজ উপাদান, যা আমাদের ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

মাটি দিয়ে গোসল করলে শরীরের দূষিত পদার্থ, ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। মাটিতে মিশে আছে অসংখ্য ভেষজ ও খনিজ উপাদান, যা ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। (১)

আল্লাহ যেসব ইবাদত করার জন্য পবিত্রতা অর্জন(অযু) করা আবশ্যক, পানি না পেলে সেসব ইবাদত করতে তায়াম্মুম করার হুকুম দেন।

কুরআনে আছে: "অতঃপর (যদি) পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞাতা প্রকাশ কর।" (২)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পবিত্র মাঠি দ্বারা মুখমন্ডল ও হাত পরিষ্কার করার হুকুম দেন, যাতে আমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পারি।

আর বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাঠি দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ, ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়

তথ্যসূত্র:
১. সূত্র: জি নিউজ

২. (সূরা আল মায়িদাহ:আয়াত ৬)

১৬/ প্রশ্ন: পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব কিভাবে হয়েছে?

উত্তর: যেখানে পানি আছে, সেখানেই প্রাণ থাকবে এ সত্যটা সবাই জানে। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে যখন প্রাণের সন্ধান করা হয়, তখন সেখানে দেখা হয় পানি আছে কিনা। পানি না থাকলে সেখানে প্রানের আশা করা হয়না। পৃথিবীর ৪ ভাগের ৩ভাগই পানি। তাই পৃথিবীতে প্রাণ ঠিকে রয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষনায় পেয়েছে, কোটি কোটি বছর আগে আবির্ভূত এলজে জাতীয় সামুদ্রিক এককোষী প্রাণীর ফসিলকে জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে গন্য করা হয়
পানির স্পর্শেই জীবনের সুত্রপাত ঘটে।

সমস্ত প্রাণীর দৈহিক গঠনের জন্য, জীবন ধারণের জন্য পানি অপরিহার্য, যার বিকল্প নেই।

জীবনের জন্য পানির উপস্থিতি যে একমাত্র পূর্বশর্ত, এ পরম সত্য বৈজ্ঞানিক গবেষনায় প্রমাণিত।

এই পরম সত্যই আল কুরআনে সংক্ষেপে নিখুঁতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৪০০শ বছর পূর্বে।

করআনে আছে "অবিশ্বাসীরা কী দেখে না? আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবী একত্রে ছিল, অতঃপর উভয়কে পৃথক করলাম। এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" (১)
"আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (২)

তথ্যসূত্র:
১. সূরা আম্বিয়া:আয়াত ৩০

২. সূরা নূর:আয়াত ৪৫

১৭/ প্রশ্ন: পানিচক্র। কুরআন কি বলে?

উত্তর: পদার্থবিজ্ঞান বলে, পদার্থের তিনটি অবস্থা রয়েছে: কঠিন, তরল ও বায়বীয়। যেই পদার্থ যত হালকা হয়, সেটি ততো উপরে থাকে। আর ধোয়া, আগুণ ও গ্যাসীয় পদার্থগুলো হয়তো বাতাসের চেয়েও অনেক হালকা হয়ে থাকে। সেজন্যই এগুলো নিচে না নেমে সোজা গিয়ে উপরে উঠে

বিষয়টির সাথে অবশ্য জলীয় বাষ্পকেও সম্পৃক্ত করা যায়। কেননা আমরা যদি জলবিজ্ঞানের দিকে তাকাই তবে জানতে পারি, বৃষ্টির মাধ্যমে যেই পানিকে আমরা বর্ষিত হতে দেখতে পাই, জলীয় বাষ্প হয়ে সেই পানি আবার আকাশের দিকে উঠে যায়! সূর্যের তাপে পানি উত্তপ্ত হয়ে আস্তে আস্তে তা বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসের সাথে মিশে যায়। তা সাধারণ বাতাসের চেয়েও খুব হালকা হয়ে থাকে বিধায় এই জলীয় বাষ্প উপরের দিকে উঠতে থাকে। আর উপরের আবহাওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় জলীয় বাষ্প ঠান্ডা বাতাসের সাথে মিশে নিজে ঠান্ডা হয়ে যায় এবং ঘনত্ব বেড়ে গিয়ে বিন্দু বিন্দু জলীয় কণায় পরিনত হয়। তারপর জলীয় কণাগুলো একত্র হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। অতঃপর তা বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। পানির এই পুনরাবৃত্তিকে বলা হয় পানিচক্র।

আজকের এই আধুনিক বিজ্ঞান বিভিন্ন চিন্তা-গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে বিষয়টি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। অথচ পানিচক্রের এই বিষয়টি আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত একটিমাত্র শব্দেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন, "শপথ আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি" (১)

এখানে বৃষ্টি অর্থে আরবী 'রাজ'আ' (رجع) শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। শব্দটি যদিও পরোক্ষভাবে বৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত। তবে এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'ফিরে আসা'। এতে জলীয় বাষ্প বারবার আকাশে ফিরে যাওয়া ও বৃষ্টি আকারে পুনরায় তা মাটিতে ফিরে আসা এই পানিচক্রের প্রক্রিয়াটির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বৃষ্টি উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে এভাবেও বলেন যে, "তুমি কি দেখো না, আল্লাহ পরিচালিত করেন মেঘমালাকে, তারপর তিনি তা একত্রে জুড়ে দেন এবং পরে স্তুপীকৃত করেন, অতঃপর তুমি তার মধ্য হতে পানির ধারা বের হতে দেখতে পাও।" (২)

উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝাই যায়, জলীয় বাষ্প থেকে শুরু করে বৃষ্টি বর্ষণের পুরো চক্রটিই আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজিদে উল্লেখ করে দিয়েছেন

তথ্যসূত্র:

১. সূরা আত-তারিক: আয়াত ১১

২. সূরা আন-নূর: আয়াত ৪৩

১৯/ প্রশ্ন: স্বাধীনতার নামে কি যা ইচ্ছে তাই করা যায়?

উত্তর: স্বাধীনতা' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টির গোলামি না করা, কারো কাছে মাথা নত না করা।

কিন্তু দেশে দেশে অনেকেই অধুনা তাদের বাস্তব কার্যক্রমে বলনে চলনে 'স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার অর্থে' ব্যবহার করছেন। 'বাক স্বাধীনতা' বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে গুজব আর অসত্য প্রচার করছে অবলীলায়। কেউ কেউ চরম অসভ্যতা ও অশ্লীলতাও ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

সভ্য মানবসমাজে এসব কখনও স্বাধীনতা বা অধিকার বলে বিবেচিত হতে পারে না।

প্রত্যেকে কোন না কোন নিয়মের পরাধীন অবশ্যই থাকে। তা না হলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।
আগুন, পানি, বাতাস, খাদ্য, যাই বল না কেন, সবকিছুর ব্যবহার বিধি নিয়ন্ত্রিত। কেউ চায় না নিয়ন্ত্রণহারা পানি বা বন্যার অদম্য গতি।

প্রত্যেক বস্তুর নিয়ন্ত্রিত দিকটাই ভালো। শৃঙ্খলিত সবকিছুই মানুষের ঈপ্সিত। তা না হলে পৃথিবীতে কেউ শান্তিতে বাস করতে পারত না। মানুষরূপে বাস করতে পারত না; বরং পশুর চাইতেও অধম হয়ে নিজ নিজ স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে আপোসে লড়ে ধ্বংস হয়ে যেত

আশা করি এমন স্বাধীনতাকে কোন জ্ঞানী মানুষই বিশ্বাস ও সমর্থন করবে না। যে স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, সে স্বাধীনতা হল স্বেচ্ছাচারিতা ও মহা অপরাধ।
অতএব বাক-স্বাধীনতার অর্থ যা ইচ্ছে তাই বলা নয়, তারও নিয়ন্ত্রণ-সীমা আছে। ন্যায়অন্যায়ের মানদন্ড আছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এতেও ন্যায়-অন্যায়, পরোপকার, অপরের লাভ-ক্ষতি ও স্বাধীনতার কথাও খেয়াল রাখা জরুরী। মতামতের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যে যা ইচ্ছা তাই মন্তব্য করবে, মনগড়া মত প্রকাশ করবে এবং ন্যায়কে অন্যায় বা তার বিপরীত প্রমাণ করার জন্য বিষাক্ত কলম ব্যবহার করবে।

ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে মিথ্যা, বানোয়াট অপবাদ প্রচারের অধিকার যেমন কাউকে দেয় না, তেমনি স্বেচ্ছাচারিতা বা খামখেয়ালিপনাকেও স্বাধীনতা বলে চালিয়ে দেয়ার অধিকার দেয় না। বরং ইসলামে মিথ্যাচার, প্রতারণা, ধোঁকাবাজী, অপবাদ রটনা, অশ্লীলতা প্রদর্শন সবকিছুই নিন্দনীয় এবং যথাস্থানে দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

মনুষ্যত্ব বাদ দিয়ে মানব সমাজ যে কখনোই সুন্দর, সুশৃঙ্খল, কল্যাণকর হতে পারে

না- তা বলাই বাহুল্য। ইসলাম এ সত্যটি সকল মানুষকে বোঝানোর সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, "আপনি (রাসূল) কি তাকে দেখেননি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট"। (১)

* বলুন হে রাসূল (সা.), আমার রব অশ্লীলতা ও অসভ্যতাকে হারাম করেছেন তা প্রকাশ্য হোক অথবা গোপনীয়। তদ্রুপ সকল পাপাচার ও খোদাদ্রোহিতাও তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। (২)

তথ্যসূত্র:
সূত্র: hadithbd.com
১. ফুরকান- ৪৩-৪৪
২. সূরা আরাফ- ৩৩

২০/ প্রশ্ন: কেয়ামত কী সংঘটিত হবে? কুরআন ও বিজ্ঞান কি বলে?
উত্তর:
মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আসমান ফেটে যাবে। আর তার রবের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়।' (১)

আল্লাহ এই মহাবিশ্বের সব কিছুকে একদিন থামিয়ে দেবেন। যাকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় বলা হয়, 'বিগ রিপ' থিওরি।

বিগব্যাং' সংঘটিত হওয়ার পর থেকে মহাবিশ্ব ক্রমাগত সমপ্রসারিত হচ্ছে। তবে মহাকর্ষিক বলের জন্য মহাজাগতিক বস্তুগুলো যেমন : গ্যালাক্সি, ক্লাস্টার ইত্যাদির সমপ্রসারণগতি একটা সময় পর কমার কথা। কিন্তু গতি না কমে বরং ক্রমে বেড়েই চলেছে। এরা যত একে অপরের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে, ততই তাদের দূরে যাওয়ার গতি বাড়ছে।

যা দেখে উপলব্ধি করা যায়, মহাকর্ষ বলের বিপরীতে কোনো অজানা শক্তি এখানে কাজ করছে। এই অজানা শক্তিটির নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন 'ডার্ক এনার্জি'।

এই ডার্ক এনার্জির জন্য গ্যালাক্সিগুলো দূরে যেতে শুরু করলেও এর ভেতরে থাকা গ্রহ-নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে আবদ্ধ থাকে।

বিগ রিপ থিওরি অনুযায়ী এমন একটা সময় আসবে, যখন ডার্ক এনার্জির প্রভাব এতটা বাড়বে, যার ফলে গ্রহ-নক্ষত্র তাদের মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে আর আবদ্ধ থাকবে না। গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একে অন্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে এবং বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়বে বা ছিঁড়ে যাবে। এতে এসব গ্রহ-নক্ষত্র টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। এভাবে সমগ্র মহাবিশ্বই একসময় ভেঙ্গে যাবে। আকাশ ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীদের একটি ভাষ্য হলো, এমন দিন আসবে, যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শ্বাস নেওয়ার মতো বাতাস, অক্সিজেন থাকবে না। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে ওজোনস্তর। ফলে মানুষ তো বটেই, কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ বাঁচতে পারবে না এই গ্রহে।

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।" (২)

কিয়ামত সংঘটিত হবে, এটা চরম এক সত্য। সবাইকেই সেদিন নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। নিজ নিজ আমলনামা দেওয়া হবে সেদিন। যার আমলনামা অর্জিত হবে ডান হাতে, সে চিরস্থায়ী জান্নাতে যাবে। আর যার আমলনামা থাকবে বাম হাতে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ আমাদের জান্নাতী হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমিন।

তথ্যসূত্র:
১.সুরা : ইনশিকাক, আয়াত : ১-২
২. সূরা আনআম, আয়াত: ১২
সূত্র: erfan.ir

২১/ প্রশ্ন: মিসওয়াকের চেয়ে কী ব্রাশ ভালো?
উত্তর: বিশেজ্ঞদের মতে ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের দূষণ থেকে সৃষ্টি হয়। তাই দাঁত পরিষ্কার করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। অধিকাংশ মানুষ দাঁত পরিষ্কার করতে টুথব্রাশ ব্যাবহার করে থাকে।

কিন্তু গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী টুথব্রাশ ব্যাবহার নিরাপদ নয়। কেননা টুথব্রাশ ব্যবহারে বেশ কয়েকটি সমস্যা রয়েছে।

যেমন :

• ব্রাশ যখন ব্যবহার করা হয় তখন এতে জীবাণুর ভিত্তি জমে যায়। পানি দ্বারা ধৌত করলেও জীবাণুগুলো যায় না বরং তা বংশবৃদ্ধি করে

• ব্রাশের কারণে দাঁতের উপরিভাগে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতার ভিত্তি নষ্ট হয়ে যায়

• মাড়ি ধীরে ধীরে নিজস্থান থেকে সরে যায়, ফলে দাঁত ও মাড়ির মধ্যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয় এবং তাতে জীবাণুগুলো তাদের স্থান তৈরী করে নেয়।

এতে অন্যান্য রোগ-ব্যাধি ছাড়াও চোখের নানা ধরণের রোগ-ব্যাধিও জন্ম নেয়। ফলে দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে মিসওয়াক, প্রথমত রাসূল ﷺ এর সুন্নাত। মিসওয়াকে ভেষজ জাতীয় পদার্থ থাকে যা দাঁতের জন্য খুবই উপকারী এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত

রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (১)।

মিসওয়াকের বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। যেমন: রাসূল ﷺ এর বানী, 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিস্কার রাখে এবং তার দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। (২)।

তাছাড়া নিয়মিত মিসওয়াকের বৈজ্ঞানিক বেশ কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে: মিসওয়াক করলে সর্দি, কাশি ও কফ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

মিসওয়াককারীর মুখস্ত শক্তি বেড়ে যায়।

মাথা ব্যথা দূর হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত চোখের রোগ দূর হয়।

প্লেগ রোগ দূর হয়।

ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ হয়।

দাঁতের টিস্যু নিরাময় নিয়ন্ত্রণ করে।

এছাড়াও মিসওয়াক করার অনেক ফযিলত রয়েছে।

সর্বোপরি রাসূল ﷺ এর এ সুন্নাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য এগিয়ে যেতে পারি।

আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই তো মুমিনের সবচেয়ে বড় চাওয়া ও পরম পাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ.

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড় বিষয়। (৩)

তথ্যসূত্র:
১. বুখারী হাদিস: ৮৮৭, ৭২৪০ ও মুসলিম হাদিস: ২৫২
২. সুনান আন নাসায়ী,হাদিস: ৫
৩. সূরা তাওবা: আয়াত ৭২

২২/ প্রশ্ন: আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ?

উত্তর: মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু তারা এর নিদর্শনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' (১)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ কেন আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বলেছেন?

এর কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ দেখা যাক:

আমাদের এই পৃথিবীর চারিদিকে Atmosphere , Ocean of Gas ছড়িয়ে আছে যা প্রায় ১০ হাজার কি. মি পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই লেয়ার এমন শক্ত যে , স্টোনের চেয়েও বেশি শক্ত মনে হয়। যা আমাদের এই পৃথিবীকে বসবাস উপযোগী করে রেখেছে।

এই আকাশ পৃথিবীকে আক্রমন থেকে রক্ষা করে।

যে কোন Stone/ Meteor/ Meteorites বাইরের গ্রহ থেকে আসলে আকাশের স্তরে ভেংগে চূর্ণ হয়ে বিলিন হয়ে যায়। ফলে পৃথিবিতে এসে পৌছায় না। এখানে আর একটি কারন হল এই স্তরে ২৫০ কি.মি উপরে তাপমাত্রা কিছু অংশ বেড়ে ২৫০০ ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে যার ফলে বাহিরের মহাশূন্যে যে মিলিয়ন মিলিয়ন শক্ত Stone/ Meteor/ Meteorites আছে তা আসলে তা চূর্ণ হয়ে যায়

যদি এই Atmosphere , Ocean of Gas layer না থাকত তাহলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি আর তাপমাত্রায় পুড়ে যেত পৃথিবীর সব কিছু ।

কয়েক স্তরের এই লেয়ারে, যা বেশি সূর্যের তাপ আর ক্ষতিকর অতি বেগুনি রশ্মি ফিল্টার হয়ে আমাদের পৃথিবিতে আসে সহনীয় মাত্রায় । এভাবে আকাশের বিভিন্ন স্তর পৃথিবীকে সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে রক্ষা করছে।

পৃথিবিকে এই ভাবে সুরক্ষিত রাখার এত কিছু বলে দেয় যে এই সব কিছু পরিকল্পিত ভাবে একজন সৃষ্টি করেছেন তিনি আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন, 'তারা কি তাদের ওপরের আকাশের দিকে তাকায় না যে আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি ও সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোনো ফাটলও নেই? (২)

পবিত্র কোরআনে সৃষ্টিজগতের নানা বিষয় উল্লেখ করে তা নিয়ে ভাবতে বলা হয়েছে। কারণ সব কিছুর পেছনে একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আছেন। আর মানুষ যেন সেই মহান সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। ইরশাদ হয়েছে, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, যার ওপর দিয়ে তাদের (মানুষের) বিচরণ হয়; কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (শিক্ষা অর্জন করে না)। তাদের অধিকাংশই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে বিশ্বাস স্থাপন করে।' (৩)

তথ্যসূত্র:
১. সুরা আম্বিয়া: আয়াত ৩২

২. সুরা কাফ: আয়াত ৬

৩. সুরা ইউসুফ: আয়াত ১০৫-১০৬

২৩/ প্রশ্ন: কুরআন কি আল্লাহর বাণী? সবকিছুর ই একজন সৃষ্টা আছেন,তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: বাক্যটি ভুল যে সবকিছুর ই একজন সৃষ্টা আছে।বরং বাক্যটি এমন হবে - প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর স্রষ্টা আছে।আল্লাহর সঙ্গা হচ্ছে অসৃষ্ট।সর্বসৃষ্ট সৃষ্টার কোনো সৃষ্টা নেই যদি তিনি সত্যিকারের সৃষ্টা হন।

২৪/ প্রশ্ন: কুরআন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ নাকি অসঙ্গতিপূর্ণ?

উত্তর: মহিমান্বিত কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয় বরং এটা হচ্ছে চিহ্ন বা ইংগিতের বই।এটা আয়াত বা নিদর্শনের বই।এতে ৬ হাজারের অধিক আয়াত রয়েছে যার মধ্যে ১ হাজারের অধিক আয়াত ই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে।এতে এমন কিছু বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা সত্য রুপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।এতে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা ধারণা আলোচনা করা হয়নি। কারণ এসব সূত্র বা ধারণার ভিত্তি হচ্ছে প্রমাণহীন অনুমিতি।কারণ বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান তার নিজের দিকে ফিরে বিপরীত ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

২৫/ প্রশ্ন: কুরআন দ্বারা কি সাত আকাশের সংখ্যা প্রমাণিত?
উত্তর: আদী-অন্তহীন মহাকাশ-মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ৭ টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছে যাকে সপ্ত আকাশ বলে।নবম শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞানী আল কারেজমী সর্বপ্রথম আকাশের স্তর ৭ টি সম্পর্কে ধারণা পেশ করেন।উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা এ তথ্যের ভিত্তিতে মহাকাশে অভিযান চালিয়ে তা নিশ্চিত করেন।মহাকাশে সাত ধরনের আকাশী বস্তু বিদ্যমান।১)নক্ষত্র ২)গ্রহপুঞ্জ৩)উপগ্রহপুঞ্জ ৪)ধুমকেতু ৫)নীহারিকা ৬)ছায়াপথ ৭)কোয়াসার ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র:
* সূরা বাকারা: আয়াত নং ২৯,

* সূরা নূহ: আয়াত নং ১৫,

* সূরা তালাক: আয়াত নং ১২,

* সূরা মুলক: আয়াত নং ৩,

* সূরা মু'মিনুন: আয়াত নং ৮৬

২৬/ প্রশ্ন: বিগ ব্যাং থিওরির প্রমাণ কুরআনের কোথায় আছে?

উত্তর: “কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, একসময় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম এবং জীবন্ত সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা অবিশ্বাস করবে?" (সূরা আম্বিয়া, আয়াতঃ ৩০)।

বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী একসময় মহাবিশ্বের সকল বস্তু একটি বিন্দুতে আড়ষ্ট অবস্থায় ছিল। অতঃপর বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা আলাদা হয়ে গেছে। তাছাড়া সমস্ত জীবদেহের ৮০-৮৫%-ই পানি দিয়ে গঠিত।

"অতঃপর তিনি পৃথিবীর দিকে মনোনিবেশ করেন;যা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ।" (সূরা ফুসসিলাত, আয়াতঃ ১১)।

এখানে ধুম্রপুঞ্জ বলতে পৃথিবীর আদি অবস্থার কথা বলা হয়েছে।'ধুম্র' শব্দের অর্থ-ধোয়া বা গ্যাস। বিগ ব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবী একসময় অত্যন্ত উত্তপ্ত, জ্বলন্ত ও গ্যাসের পিণ্ড ছিল।

তথ্যসূত্র:
১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত নং ৩০

২. সূরা ফুসসিলাত: আয়াত নং ১১

২৭/ প্রশ্ন: কিয়ামত কি আসবে? বিজ্ঞান কী বলে?

উত্তর: মহাকাশের সমাপ্তি ঘটবে এমন এক সময়ে যখন এর গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং মহাকর্ষীয় শক্তির প্রাবল্য বেগবান হবে।সাথে সাথে সম্প্রসারণ গতি থেমে যাবে।ফলে গ্রহ,উপগ্রহ,নক্ষত্র,গ্যালাক্সি,কোয়াসার প্রভৃতি জ্যোতিস্ক —মহাকর্ষীয় টানে পরস্পরের নিকট এসে সংঘর্ষ শুরু করবে।বিশাল মহাজগৎ একটি বিন্দুতে এসে Closed হবে।

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দপ্তর; যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য; আমি এটা পালন করবই।**"** (আম্বিয়া:১০৪)

"সেদিন পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গুড়া হয়ে যাবে।**"** (সুরা ফাজর:২১)

"সেদিন আকাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং গ্রহসমূহ ছড়িয়ে পড়বে।**"** (সুরা ইনফিতার:১-২)

" সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পৃথক হয়ে যাবে।**"** (সুরা ইনশিক্বক: ১)

২৮/ প্রশ্ন: বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে?

উত্তর: সম্প্রতি, Closed Big Bang বা Closed Universe তত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বলেছেন:মহাবিশ্ব (Whole universe) একটি বিন্দুতে closed হওয়ার পর এমন এক শক্তিধর সত্ত্বা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে-যিনি মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ শক্তি (Gravitation & Gravity) দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে ধারণ করে রেখেছিলেন।

“ মহাবিশ্বের প্রত্যেক জিনিস ই ধ্বংসশীল।আর অবশিষ্ট থাকবে মহামহিম ও মহানুভব আপনার রব্বের চেহারা (সত্তা)।” (সুরা রহমান:২৬-২৭)

২৯/ প্রশ্ন: ইসলামের মানুষের খাবারের বাধ্যবাধকতা কি আছে ?

উত্তর: সুস্থ-সবল শরীরে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং শারীরিক পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেলে তা স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।অর্থাৎ,অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ও অপচয় করা থেকে নিরুৎসাহ করা হয়েছে

৩০/ প্রশ্ন: খাদ্য গ্রহণে ও ইসলামের রীতি নীতি

উত্তর: ১) হালাল খাদ্য গ্রহণ ও বৈধ পন্থায় উপার্জন হালাল খাদ্য খেতে হবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-‘হে রাসূলগণ! পবিত্র হালাল বস্তু আহার করুন এং সৎ কাজ করুন।-সূরা মুমিনূন : ৫১ ,‘হে মানব সম্প্রদায় পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।’-সূরা বাকারা:১৬৮ ২) উপার্জিত খাদ্য বৈধ পন্থায় হতে হবে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।’-(সূরা নিসা : ২৯)

৩১/ প্রশ্ন: ইসলামে শূকরের গোশতকে কেন নিষিদ্ধ করা হলো?

উত্তর: কোরআনে শুকরের গোশত খাওয়ার ব্যাপারে কম বেশি ৪ স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। (২:১৩৭, ৫:৩, ৬:১৪৫, ১৬:১১৫) মুসলমানদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, শুকরের গোশত কেন হারাম করা হয়েছে। খ্রিষ্টানরা নিজের গ্রন্থেও এর তথ্য দিয়েছে। বাইবেলের deuteronomy অর্থাৎ এস্তেনোমীতেও শুকরের গোশতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে,"তোমাদের জন্য এ কারণে নাপাক যে, এর পা বিচ্ছিন্ন কিন্তু সে পরিস্কার হয় না। তোমরা এ গোশত খেও না এবং এর লাশ স্পর্শও কর না।" বাইবেলের ইয়াইয়াহ ধর্ম গ্রন্থের অধ্যায় ৬৫ শ্লোক নাম্বার ২ থেকে ৫ পর্যন্ত শুকরের

গোশতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে৷ তাছাড়া শুকরের গোশত বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৭০ প্রকারের রোগ-ব্যাধির জন্ম দেয়।

শুকর ভোক্তার যা হয়:

১. পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে কয়েক প্রকারের জীবাণু জন্ম লাভ করে যেমন, ওয়াল্ডওয়ার্ম, পেন ওয়ার্ম, হুক ওয়ার্ক ইত্যাদি। এর মাঝে সবচেয়ে মারাত্নক Taenia Soluim যাকে সাধারণভাবে 'কাদু দানা' বলা হয়। এটাকে অন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং অনেক লম্বা হয়।

২। এর ডিম্বাণু রক্তের মধ্যে মিশে শরীরের প্রায় সকল অংগে পৌছে যায় এবং যদি মগজের মধ্যে পৌছে তাহলে স্মৃতির ওপর প্রভাব ফেলে।

৩।যদি হৃদয়ের মধ্যে পৌছে তাহলে তাহলে হার্ট এ্যাটাক হতে পারে।

৪। যদি চোখে চলে যায় তাহলে নাবিনাপেন জন্মগ্রহণ করে।

৫। যদি জঠরে তাহলে জঠরের ক্ষতির কারণ হয় এবং শরীরের প্রায় সকল অংগের ক্ষতি সাধন করে।

৬। শুকরের গোশতের চেয়ে এর চর্বির মূল্য বেশি এবং চর্বি অত্যধিক পরিমাণে হয়। আমেরিকার শতকরা ৫০ ভাগ লোক উচ্চরক্তচাপের রোগী।

৭। আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে অধিক নিকৃষ্ট জিনিসে ভোক্তা এবং ময়লা আবর্জনার ওপর লালিত-পালিত প্রাণী বানিয়েছেন শুকরকে। গ্রামের এলাকায় উন্মুক টয়লেটও ওরা খায়। দুনিয়াতে সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যে লজ্জাহীন এবং এটা একমাত্র প্রাণী যে, অন্য সংগীকে নিজ স্ত্রী শুকরী সংগীর সংগে জৈবিক চাহিদা পূরণের আহবান জানায়। আমেরিকার অধিকাংশ লোক এর গোশত ভক্ষ্ন করে এবং কয়েকবার dance পার্টির পরে নিজ স্ত্রীদের বদল করে। এটা পরিস্কার যে ব্যক্তি এদের গোশত ভক্ষণ করে এদের দ্বারাই এরুপ কাজ সম্ভব।

৩২/ প্রশ্ন: মেয়েদের পর্দা নামক বিষয় বলে ইসলাম দমিয়ে রেখেছে। পুরুষদের জন্য তো এমন কিছু নেই? এখানে কি ইসলাম নারীদের খাটো করে নি পর্দার মাঝে আটকে রেখে?

উত্তর: ইসলামে দিয়েছে নারীদের উচ্চ মর্যাদা। নারী বেধে রাখা হয় নি বরং মর্যাদা মন্ডিত করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে পুরুষের জন্যই পর্দার আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে নারীর পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছে। সুরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে।

মেয়েদেরকে যেমন পর্দার মাঝে থাকতে বলা হয়েছে তেমনভাবে নারীর প্রতি পুরুষদের দৃস্টি পড়লে কোন অসংগত ও নির্লজ্জ চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে, এটার যেন সুযোগ না হয় তাই পুরুষকে তার দৃস্টিকে অবনত রাখতে বলা হয়েছে।

পুরুষই শুধু অবনত রাখবে এবং নারীরা পর্দাহীন চলাফেলা করবে এটা কোনভাবেই আল্লাহ অনুমতি দেন নি। উভয়ইকেই উভয়ের পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে। আমাদের বানিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা, কোরয়ান পাঠিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা, এটাই আমাদের জীবন বিধান এই বিধান মেনে চলার মাঝেই আমাদের সাফল্য।

অন্যথায় পশ্চিমাদের মত অবস্থা হবে। যেমন ধর্ষণের হার USA তে সবচেয়ে বেশি (জাকির নায়েক নেকচার সমগ্র ০১: পেইজ ১৬, উত্তর ৯, পেইজ ১৭৩-১৭৬)

৩৩/ প্রশ্ন: পশ্চিমা নারী অধিকার vs ইসলামে নারী অধিকার

উত্তর: নারী স্বাধীনতার পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে তার দেহ ভোগের মেকি প্রতারনা বৈ ভিন্ন কিছু না। এটি নারী মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা এবং নারী সত্তাকে অবমূল্যায়ন করার নামান্তর।
পশ্চিমা মিডিয়া বর্ণিত দৃষ্টিকোণ থেকে 'ইসলামে নারী অধিকার' -এর সাথে যদি কেউ এতমত পোষণ করে, তবে এ কথা বলা ছাড়া বিকল্প থাকে না যে ইসলামে নারী অধিকার সেকেলে!

ইসলামের মূল উৎস হলো, পবিত্র কুরআনের বাণী এবং সুন্নাহ তথা রাসূল সা. -এর বাণী।
প্রত্যেকটি মুসলিম নারী-পুরুষ যাই হোক তার কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি “অর্জন করা এবং তার প্রতিনিধি হিসেবে এ দুনিয়ায় কাজ করা। নিজের মতে সন্তোষ অর্জন ও খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়।

ইসলাম নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। এক্ষেত্রে সমতা মানে অভিন্নতা নয়। ইসলামে নর-নারীর ভূমিকা সম্পূরক - বৈপরীত্যের নয়; সম্পর্ক অংশীদারীত্বের - বিরোধিতার নয়।
আধুনিক সেকেলে নয়।

'ইসলামে নারী অধিকার' -এর মূল্যায়ন হবে ইসলামের মূল উৎসের আলোকে। মুসলমানরা কি করে, তার উপর ভিত্তি করে নয়।

৩৪/ প্রশ্ন: ইসলামে জান্নাত শুধু পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য নয়?

উত্তর: "যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোনো সংকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। " কুরআনের এরূপ আয়াত এর মাধ্যমে এ ভুল ধারণা দূর করা যায়।

সুতরাং বোঝা যায় যে, ইসলামে জান্নাতে প্রবেশের জন্য জেন্ডার (লিঙ্গ) কোনো মাপকাঠি নয়। পুরুষের মধ্য হতে এবং নারীদের মধ্য হতে যে ব্যক্তিই সৎ কাজ করবে এবং বিশ্বাসী হবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।
আর কোন ব্যক্তির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভালো কাজেরও প্রাপ্য অর্জন করবে। আল্লাহ সুবহানআল্লাহু তা'আলা নিঃসন্দেহে ন্যায়বিচার।
কারো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভালো কাজের যেমন প্রতিদান রয়েছে, তেমনি কারো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মন্দ কাজের জন্যও শাস্তি নির্ধারিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়েও নারী-পুরুষের মধ্যে তারতম্য করেন নি।

তথ্যসূত্র:
*সূরা নিসা: আয়াত ১২৪

*সূরা আন-নাহল: আয়াত ৯৭

৩৫/ প্রশ্ন: পশ্চিমারা বলে থাকে নারীর কোন আত্মা নেই। এ বিষয়ে ইসলামের কি বলে?

উত্তর:
সপ্তদশ শতকে,

রোমে সমবেত হওয়া বিত্তবানদের একটি কাউন্সিলে তারা সর্বসম্মতিক্রমে একমত হয়েছিল যে, নারী-পুরুষের কোনো আত্মা নেই।

এ থেকেই পশ্চিমারা এ ধরণের ভুল বিশ্বাস তার ধারণা করছে যে নারীর কোন আত্মা নেই।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর একই প্রকৃতির আত্মা রয়েছে যা কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী। ভয় কর তোমাদের প্রভুর যিনি তোমাদেরকে একটি আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গিনীকে। [সূরা নিসা,]
অর্থ : তিনি (আল্লাহ) আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। [সূরা আশ শূরা, আয়াতে ১১]

ইসলামে নর-নারীর আত্মার প্রকৃতি একই। কুরআনে নর-নারীর আত্মার বিষয়ে কোন পার্থক্য রাখে নি। ভিন্ন কোন মতবাদও নেই। বরং কুরআন নারী-পুরুষের সমতা বজায় রেখেছে।

আল-কুরআন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে,
অর্থ : অতঃপর আমি যখন তাঁকে (আদম আ.) ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব তখন তোমরা তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো। [সূরা আল হিজর, আয়াত ২৯]

একই বিষয়ে মহান আল্লাহ পুণরায় বলেছেন,
অর্থঃ অতঃপর তিনি তাঁকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন। [সূরা সাজদা, আয়াত ৯]

এর অর্থ হলো, আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তাঁর থেকে আত্মিক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, আরও দান করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর জ্ঞান যাতে মানবতা তার নিকটবর্তী হতে পারে।
এখানে আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ের কথাই বলা হয়েছে, উভয়কেই আল্লাহর রূহ থেকে ফুঁক দেয়া হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:
*সূরা নিসা,

*সূরা আশ শূরা, আয়াতে ১১

*সূরা আল হিজর, আয়াত ২৯

*সূরা সাজদা, আয়াত ৯

৩৬/ প্রশ্ন: পশ্চিমাদের ধর্মাদর্শে মতে নারীকে মানব পাপে মূল উল্লেখ হয়, ইসলামের এখানে কিভাবে সমতা নিশ্চিত করে?"

উত্তর:আল্লাহ মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন, যেন মানুষ তাঁর ফরমান দুনিয়ায় জারি করতে পারে।

অর্থ: নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। [সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ৭০]

এখানে সকল আদম সন্তানকে অর্থাৎ পুরুষ এবং নারীকে সম্মানিত করা হয়েছে। বাইবেলে মানবতার পতনের জন্য হাওয়া (আ)-কে দায়ী করে। শুধুমাত্র হাওয়া (আ)-কে দায়ী করা হয়েছে এবং 'মূল পাপ'-এর বিশ্বাস অনুযায়ী হাওয়া (আ)-এর কারণে সকল মানবতা পাপের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

আল-কুরআনের ৭নং সূরা আরাফ এর ১৯ থেকে ২৭ নং আয়াতগুলো আদম ও হাওয়াকে অসংখ্য বার সম্বোধন করা হয়েছে। উভয়েই আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন, উভয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করেছিলেন এবং উভয়কে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। কুরআনে এ ধরণের কোন পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি এবং কোথাও নারীদের হেয় করা হয়নি। ইসলামে নারীদের বরং অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র:
*সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ৭০

*সূরা আরাফ : আয়াত ১৯ থেকে ২৭

৩৭/ প্রশ্ন: আধুনিক পশ্চিমা সমঅধিকার নীতি অনুসারে সন্তান গ্রহণ করা নারী পশ্চাদ্ধাবনের অন্যতম মূখ্য কারণ। তাছড়া তাদের ধর্মগ্রন্থেও গর্ভধারণ ও প্রসব বেদনাকে শাস্তিসরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম কিভাবে এক্ষেত্রে নারীদের মূল্যায়ন করছে? নারীর জন্য সন্তান জম্মদান করাকে ইসলামে কিভাবে গ্রহণ করছে?

উত্তর: বাইবেলের জেনেসিসের বলা হচ্ছে-

তুমি গর্ভধারণ করবে, দুঃখের মাঝে জন্ম দেবে, তোমার আশা হবে তোমার স্বামী এবং সে তোমাকে শাসন করবে।

অর্থাৎ গর্ভধারণ ও শিশু জন্মদানকে বাইবেলে নারীদের জন্য অসম্মানজনক এবং প্রসব বেদনা এক ধরনের শাস্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অথচ আল-কুরআনে বলা হয়েছে গর্ভধারন এবং শিশু জন্মদান প্রকৃতপক্ষে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

অর্থ : আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লেগেছে।

তাই আমি নির্দেশ দিলাম আমার ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার নিকটই ফিরে আসতে হবে। [সূরা লুকমান আয়াত ১৪]
অর্থ : আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তাঁর মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। [সূরা আহকাফ আয়াত ১৫]

এছাড়া ইসলাম নারীদের জন্য বিশেষ শিথিলতা প্রদর্শন করেছে। নারী যখন ঋতুবতী বা গর্ভবতী হন তখন তাঁকে সাওম পালন করতে হবে না, তবে পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য ভালো হলে সাওম পালন করতে হবে।

ঋতুকালীন ও সন্তান জন্মদানের পর তাঁকে সালাত আদায় করতে হয় না। পরবর্তীকালেও এ সালাত আদায় করতে হবে না।

তথ্যসূত্র:
*সূরা লুকমান: আয়াত ১৪

*সূরা আহকাফ: আয়াত ১৫

৩৮/ প্রশ্ন: পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ে নারী-পুরুষ সমতা ইসলাম কিভাবে রক্ষা করছে?

উত্তর: আল্লাহর দৃষ্টিতে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হলো- 'তাকওয়া' তথা আল্লাহভীতি বা ন্যায়নীতি।

অর্থঃ ওহে মানবমণ্ডলী! আমরা তোমাদের এক জোড়া মানব-মানবী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত করেছি তোমাদের পরিচিতির জন্য। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে। [সূরা আল হুজুরাত আয়াত ১৩]

লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, সম্পদ এগুলো ইসলামের কোনো মাপকাঠি নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে মাপকাঠি হলো 'তাকওয়া'।

কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ কি নারী এটাও কোনো মাপকাঠি নয়।
অর্থ : আমি তোমাদের কোনো কর্মীর কাজ নষ্ট করি না, সে নারী হোক কি পুরুষ, তোমরা পরস্পরের সঙ্গী। [সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৯৫]

কুরআনে অনুগ্রহ প্রাপ্তদের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি গুণের কথা বলা হয়েছে।
অর্থ : আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিশাল প্রতিদান নির্ধারণ করে রেখেছেন। এ আয়াতে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে,

ইসলামে আত্মিক ও নৈতিক কর্তব্য নারী-পুরুষের জন্য সমান। [সূরা আল আহযাব, আয়াত ৩৩-৩৫]

নারী-পুরুষ উভয়কে ঈমান আনতে হবে, সালাত আদায় করতে হবে, সাওম পালন ও যাকাত আদায় করতে হবে ইত্যাদি।

দুনিয়া এবং পরকালের জীবনে পুরস্কার ও শাস্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা পুঙ্খানুপুঙ্খ ন্যায় বিচারে মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের পুরস্কৃত বা লাঞ্ছিত করবেন। সকল বিষয়ে সুষম বিচার করবেন। তাঁর কাছে বান্দা বিন্দু পরিমাণ জুলুমের স্বীকার হবে না, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী।

তথ্যসূত্র:
*সূরা আল হুজুরাত: আয়াত ১৩

*সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯৫

*সূরা আল আহযাব: আয়াত ৩৩-৩৫

৩৯/ প্রশ্ন: রাসূল ﷺ মল-মূত্র ত্যাগের জন্য দূরবর্তী জায়গায় হেঁটে যেতেন। সুন্নাহের এই পদ্ধতির এর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা।

উত্তর:
দুনিয়া আজ আবার রাসূল ﷺ জীবনযাপন ও কর্মপদ্ধতির দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে, যে তরীকায় নবী করীম ﷺ আমাদের জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন

এবং যে পদ্ধতিতে তিনি নিজে জীবনযাপন করেছেন। ইস্তেঞ্জার ওপর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতগুলোর বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে।

রাসূল ﷺ পায়খানা প্রস্রাবের জন্য বহু দূর হেঁটে যেতেন। পায়খানা প্রস্রাবের জন্য দূরে যাওয়া অনেক বেশি উপকারী।
বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে কয়েকটি বাস্তব বিশ্লেষণের বর্ণনা দিচ্ছি।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান বেশি বেশি চলাফেরার ওপর জোর দিচ্ছে এমনকি মার্কিন মুল্লুকের বড় বড় হাসপাতালগুলোতে একথা লেখা রয়েছে,
'পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে না বাহন?' একথা স্পষ্ট যে, পা প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে।
এ বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে বেশি বেশি করে পায়ে চলার দিকে আহ্বান জানানো। বায়োকেমিস্ট্রির (প্রাণরসায়ন) জনৈক বিজ্ঞ অধ্যাপক বলেন, “যখন হতে শহরের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে, বসতি বাড়তে থাকে এবং চাষক্ষেত্র কমতে থাকে সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে। কারণ যখন হতে দূরে পায়খানা প্রস্রাব করা পরিত্যাগ করা শুরু হয়েছে,
সে সময় থেকে অদ্যাবধি গ্যাস, পেট ও পাকস্থলীর পীড়াগুলো বেড়ে চলেছে। "

মানুষের চলার ফলে অন্ত্রগুলোর নড়া-চড়া বেড়ে যায়, যার দ্বারা পায়খানা প্রস্রাব সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা পায়খানার ভিতরেই প্রস্রাব করি এবং বাইরে চলে যাই না।
এ জন্য পায়খানা সহজ হয় না, যার কারণে পায়খানায় বেশি সময় থাকতে হয়।

৪০/ প্রশ্ন: সুন্নাহ অনুসারে মল-মূত্র ত্যাগের পদ্ধতি কতটুক স্বাস্থ্য সম্মত?

উত্তর: আধুনিক বিজ্ঞান নবী করীম ﷺ এর এই পায়খানা প্রস্রাবের পদ্ধতির ওপর ধারাবাহিক গবেষণা করছে এবং বর্তমানে অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও এর উপকারিতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করছেন।

স্বাস্থ্য ও জীবন স্থায়িত্ব এবং সুন্দর ব্যবস্থার জন্য ইসলামের নবী করীম ﷺ এর প্রয়োজনীয় পদ্ধতির চেয়ে বড় কোনো পদ্ধতি নেই। ইসলামের নবী করীম ﷺ এর এ পদ্ধতির ওপর আমল করায় গ্যাস, বদহজম, পাইলস,
গেজ ইত্যাদি রোগগুলো বাস্তবেই কমে যায়, এবং বিশেষ করে নবী করীম ﷺ এর পদ্ধতি আপনা-আপনি এ সব ব্যাধিকে ধ্বংসও করে দেয়।

একটি ব্যাখ্যায় দেখা যাক, নিউভাল পল (Louval Poul) তাঁর রচিত বই 'স্বাস্থ্যবিধি'-তে লিখেছেন :

“মানবতার স্থায়িত্ব মাটিতে এবং তার ধ্বংসও মাটিতে। যখন থেকে আমরা মাটির ওপর পায়খানা পেশাব করা ত্যাগ করে শক্ত জায়গা (ফ্লোশ, কমোড এবং ডব্লিউ-সি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে শুরু করেছি সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যে পৌরুষ দুর্বলতা এবং পাথরের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাব প্রস্টেট গ্লান্ডস (Prostate Glands) -এর ওপর পড়ে।”

• ডব্লিউ.সি স্থাপন শরীরের প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিপরীত। যখন সুন্নাত মোতাবেক পায়খানা প্রস্রাব করা হয়, তখন পুরো শরীর ঢিলে হয় এবং পায়ুকে পায়খানা বের করার উপযোগী করে দেয়।

কিন্তু ডব্লিউ.সি ব্যবহারে সমস্ত শরীর ঢিলে হয় না এবং পায়খানার স্থানও সংকীর্ণ থাকে। যার ফলে মানসিক, লিভার, পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের রোগ-বালাই হয়ে থাকে।

• এ ডব্লিউ সি-তে পায়খানা প্রস্রাব করলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে না, যে কারণে পেট এবং পাকস্থলীতে নানান রোগ সৃষ্টি হয়। যেমনঃ পাকস্থলীর জ্বালা, বদ হজম এবং গ্যাস্ট্রিক-আলসার ইত্যাদি।

• ডব্লিউ সি-এর সহায়তায় পায়খানা করার কারণে প্রয়োজন পূরণ পরিপূর্ণভাবে হয় না, যার পরিণামে বিভিন্ন রোগের জন্ম হয়। যেমন- ধ্বজভঙ্গ, বমন, পাকস্থলীর জ্বালা, লজ্জাস্থানের ক্ষত-জ্বালা-পোড়া, গ্যাস ইত্যাদি।

• ডব্লিউ সি-এর ওপর বসে পায়খানা প্রস্রাব করায় শরীরে টানা হেঁচড়া হয় যার দ্বারা মানবদেহের ক্ষতি হওয়ার নানাবিধ আশঙ্কা থাকে।

মুহাম্মদ ﷺ এর দেখানো পদ্ধতি অতি উপকারী। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের নবী করীম ﷺ এর পন্থায় পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা ও আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না।

এছাড়া কোনো ধর্মেই এরূপ কোনো উদাহরণ মিলবে না। রাসূল ﷺ কী পরিমাণ সৌন্দর্যের সাথে মানুষের অপবিত্রতা ও পবিত্রতার ব্যবস্থাপনা দান করেছেন যে আজ এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন,
“বাস্তবেই নবী করীম ﷺ এর পবিত্রতার বিধানের কোনো তুলনা নেই এবং মহানবী ﷺ এর বর্ণিত এবং প্রদর্শিত পদ্ধতি অতি উপকারী।”

বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'ফ্লাশ' পদ্ধতি প্রাকৃতিক নিয়ম-পদ্ধতির কাছাকাছি। এজন্য এর ক্ষতি কমোড এবং ডব্লিউ.সি-এর চেয়ে অনেক কম।

কিন্তু কাঁচা পায়খানা এবং নরম মাটিতে পায়খানা-পেশাব করার যে ধরনের উপকারিতা তা সেখানে পাওয়া যাবে না।
বর্তমানে যেহেতু মাটি এবং খোলা জায়গা সকল স্থানে পাওয়া খুবই কঠিন এ কারণে বর্তমানে ফ্লাশ সিস্টেম উত্তম।

৪১/ প্রশ্ন: ইস্তিঞ্জা ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য নবী ﷺ মাটির ঢিলা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুন্নাহের এই পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত কি?

উত্তর:
নবী করীম ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিল ও তা বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করতেন। রাসূল ﷺ-এর এ সুন্নাতের মধ্যেও বহু বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে।

এ সময়ের বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী মাটির মধ্যে উপকারী গ্যাসীয় মিশ্রণ এবং উন্নতমানের রোগ নিরাময়ের অংশ মজুদ রয়েছে। যেহেতু পায়খানা-প্রস্রাব চরম প্রকারের বর্জ্য এবং এতে জীবাণু ভর্তি হয়ে থাকায় মানুষের চর্মে লাগা খুবই ক্ষতিকর। যদি এর কোনো অংশ চামড়ার ওপর লেপ্টে যায় অথবা হাতের ওপর রয়ে যায়, তাহলে অগণিত ব্যাধি হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

ডা. হালুক লিখেন: ঢিলের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন দুনিয়াকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল; কিন্তু বর্তমানে এ বাস্তবতা সামনে এসে গেছে যে, মাটির বিভিন্ন স্তর জীবাণু ধ্বংসকারী।

যখন ঢিলের ব্যবহার হয় তখন গোপন অঙ্গসমূহের ওপর মাটি লাগার কারণে এর ওপর লেগে থাকা তামাম জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়।

গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাটির ব্যবহার লজ্জাস্থানের যেমন জরায়ু বা প্রোস্টেট ক্যান্সার হতেও রক্ষা করে। আমি এমন কিছু রোগী দেখেছি যাদের লজ্জাস্থানে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন মাটির ঢেলা ব্যবহার করিয়েছি এবং তারা মাটির ঢেলা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করে বলেছেন তারা তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করেছেন।

বর্তমানে ইউরোপে লজ্জাস্থানের রোগ বিশেষ করে ক্যান্সার ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এটা বন্ধের জন্য যখন গবেষণা বোর্ড বসল,

তখন এ বোর্ডের রিপোর্ট মাত্র দুটি জিনিসের ওপর সীমিত বোর্ডের বক্তব্য হলো, বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য টয়লেট পেপার ব্যবহার এবং অন্যদিকে পানি ব্যবহার না করার কারণে

এ ধ্বংসকারী ব্যাধিগুলো এবং লজ্জাস্থানের ক্যান্সার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে যদি টয়লেট পেপারের সাথে সাথে পানি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ব্যবহারের ক্ষতি অনেকটাই কমে যায়।

রাসূল ﷺ ইস্তিঞ্জার জন্য প্রথমে মাটির ঢিলা ব্যবহার করতেন, তারপর পানি ব্যবহার করতেন। শুধু পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করতেন, যেহেতু হাদিসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত।' (সহিহ মুসলিম)

এরূপ ইউরোপীয় তরীকায় জীবন যাপন করা অর্থাৎ পায়খানার স্থানকে পানি ছাড়া টয়লেট পেপার দ্বারা যদি কেউ পরিষ্কার করে, তা হলে খুব শিগগিরই কয়েকটি রোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে,

১. লজ্জাস্থানের ক্যান্সার

২. ভগন্দর অথবা ফিস্টুলা

৩. ভাইরাসজনিত রোগ

৪. চর্মের ঘা বা ইনফেকশন।

পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে অবশিষ্ট ভারী মল ও আবর্জনা লোম ও দেহে আটকে নানারকম রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

পানি সৃষ্টিকূলের জন্য এক মহা নিয়ামত। এটা সমস্ত নাপাকীকে পাক বা পবিত্রতায় রূপান্তর করে। ইসলাম পবিত্রতার নিয়মকে এ পরিমাণ স্পষ্ট ও পাক বানিয়ে দিয়েছে যে, একে অমান্য করার সুযোগ নেই।

এমনকি অমুসলিম বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকগণও এর প্রশংসা না করে পারেননি।

প্রাচ্যবিদ জন মিল এর বক্তব্য হলো,

ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। সব ধর্ম এ হতে নিজেদের পবিত্রতার অধ্যায় পরিপূর্ণ করে। ইসলামের ইস্তিঞ্জার পন্থাও নজিরবিহীন। এর মাধ্যমে দেহের ওপর বর্জ্যের অণুপরিমাণও অবশিষ্ট থাকে না।

সর্বোপরি আমাদের সকল নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এই যে, এ সব মাটির মানুষ পুনরায় মাটি থেকে আরোগ্য লাভ করে।
চাইলে পৃথিবীর সব ফর্মুলা ব্যবহার করুন, এদের মধ্যে শুধু ইসলামের নবী করীম ﷺ এর পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে রোগ হতে মিলবে সুরক্ষা।

৪২/ প্রশ্ন: রাসূল ﷺ গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা বা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি?

উত্তর:

রাসূল ﷺ গোবর, হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন- গোবর (প্রাণীর বর্জ্য), হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ।' (সহীহ মুসলিম)

গোবরের মধ্যে অগণিত ক্ষতিকর জীবাণু থাকে। কারণ এটা এক প্রাণীর বর্জ্য (পায়খানা) এবং সকল বর্জ্যেই জীবাণু থাকে। গোবরের মধ্যে টিটেনাস এবং টাইফয়েড-এর জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে।
যদি গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয় তাহলে জীবাণু দেহে ঢুকে অসুখ হয়। এছাড়াও এর দ্বারা লজ্জাস্থানের অনেক পীড়া হয়ে থাকে। যেমন- খোস-পাঁচড়া, পুঁজপড়া, লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ইত্যাদি।

গোশত খেয়ে যখন হাড় বাইরে ফেলে দেয়া হয় তখন তাকে প্রাণীরা (কুকুর-বিড়াল) চেটে খায়। কিছু প্রাণীর লালার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে। যেমন- কুকুরের লালায় এক বিশেষ ধরনের জীবাণু থাকে, যা তার ভক্ষণকৃত হাড়ে সংক্রমিত হয়। তাছাড়া হাড়ের ওপর মাটি, ময়লা, ধুলাবালি ও দুর্গন্ধ জমে যায় এবং এ ধরনের ময়লা-ধুলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যদি এ হাড় ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে যাবতীয় জীবাণুর সাথে সাথে কুকুরের বিশেষ জীবাণুও দেহের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।
যার ফলে রক্তদূষণ, হার্ট, পেট, অন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগ হয়।

এছাড়া হাড়ের উপরিভাগ শক্ত, অসমান ও ধারালো হওয়ায় এর দ্বারা মানবদেহ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাড়ে এমন রোগ জীবাণু থাকে যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না। ইস্তিঞ্জা করার সময় এদের মাধ্যমে ক্ষতি হতে পারে।

৪৩/ প্রশ্ন: সন্ত্রাসবাদ কি?

উত্তর:

সন্ত্রাসবাদ হল সন্ত্রাসের পদ্ধতিগত ব্যবহার যা প্রায়শই ধ্বংসাত্মক এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঘটানো হয়। যদিও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের কোন বেধে দেওয়া সীমারেখা অথবা সঙ্গায়ন নেই।সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের কাছে একই বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে,তা নির্ভর করে সেই জনগোষ্ঠী বা রাস্ট্র নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যবহার করছে কিনা সন্ত্রাসবাদকে।উদাহরণস্বরূপ-

আল-মাওসুআহ আল-আরাবিয়াহ আল-আলামিয়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইরহাব (সন্ত্রাস) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা। 'রাবিতাতুল আলামিল ইসলাম' পরিচালিত 'ইসলামী ফিকহ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরিতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে- 'কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কোনো মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে।' এ সংজ্ঞা সব ধরনের নীতিবর্হিভুত ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন, ক্ষতিসাধন, অন্যায় ও বিচারবহির্ভূত হত্যা, অপরাধমূলক হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একক ও সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত যেকোনো ধরনের অন্যায় কর্ম, সশস্ত্র হামলা, চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, রাহাজানি, ভীতিকর ও হুমকিপূর্ণ কাজ এবং লোকজনের জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে, জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে এমন কর্মকাণ্ডকে শামিল করে। তা ছাড়া পরিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি, ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট বা প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করাও সন্ত্রাস হিসেবে গণ্য হবে।

৪৪/ প্রশ্ন: জিহাদ কি?

উত্তর

জিহাদ (আরবি: جهاد), যার অর্থ সংগ্রাম; কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাকে বোঝানো হয়। এর আভিধানিক অর্থ পরিশ্রম,সাধনা,কষ্ট, চেষ্টা ইত্যাদি। তবে সচরাচর ইসলামী পারিভাষিক অর্থে 'জিহাদ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

লড়াই যখন আল্লাহর জন্য, আল্লাহর রাসুলের জন্য ও তাঁর দীনের জন্য হয় এবং তা সেই পন্থায় হয়, যা শরিয়াহ নির্দেশিত বা শরিয়াহ অনুমোদিত তখন সেটাকে জিহাদ বলা হয়।

আর লড়াই যখন আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর দীনের জন্য না হয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হয় এবং তা শরিয়াহ নির্দেশিত বা শরিয়াহ অনুমোদিত পন্থায় না হয়ে অন্য কোনো পন্থায় হয় তখন সেটাকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বলে।সুতরাং জাতীয়তাবাদ রক্ষার লড়াই, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই, অনৈসলামি সাম্রাজ্য বিস্তৃতির লড়াই ইত্যাদি সবই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। একইভাবে জিহাদের নামে মুসলিম জনসাধারণকে টার্গেট করে হামলা চালানো, উম্মাহর আলিম ও মুজাহিদদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। আর আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে পরিচালিত শরিয়াহ নির্দেশিত বা অনুমোদিত আগ্রাসী বা প্রতিরোধমূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টাই হলো প্রকৃত জিহাদ।

যারা জিহাদ ও সন্ত্রাসকে মিলিয়ে ফেলে, তারা নিরেট অজ্ঞ ও মূর্খ বৈ কিছু নয়। যারা সন্ত্রাসকে জিহাদ বলে বা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে, তারা সবাই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর দুশমন। আর যারা সন্ত্রাস প্রতিরোধের স্বার্থে জিহাদের সংজ্ঞাকেই আমূল বিকৃত করে উপস্থাপন করে, তারা মুলহিদ, মুনাফিক ও জিন্দিক।

৪৫/ প্রশ্ন: সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদের মধ্যে পার্থক্য

উত্তর:

জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদ কখনো এক নয়। জিহাদ একটি ইবাদত। এর রয়েছে কিছু মহান উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ বা অন্যান্য যুদ্ধ কখনো ইবাদত নয়। বরং তা হারাম কাজ। আল্লাহর বিধান পালন করতে সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে আভিধানিক ভাবে জিহাদ বলে ।

জিহাদ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার আগে দেখি জিহাদ সম্পর্কে রাসুল সাঃ কি বলেছেন -

"সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো জালিম শাসক বা প্রশাসকের কাছে ইনসাফের কথা বলা" (তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৭১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৪;ইবনু মাজাহ আস-সুনান ২/১৩২৯ । হাদিসটি হাসান ।)

"যে নিজ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে সে মুজাহিদ"(তিরমিযী , আস-সুনান ৪/১৬৫,হাকিম,আল-মুসতাদরাক ১/৫৪। হাদীসটি সহীহ)

" কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণ ওযূ করা, বেশি বেশি মসজিদে গমন করা এবং এক সালাতের পরে অন্য সালাতের অপেক্ষা করা , এই হলো জিহাদের প্রহরা " (মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৯)

এই সকল হাদিস ছাড়াও আল্লাহর রাসুল সাঃ পিতামাতার খেদমতকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন । (বিস্তারিত জানতে দেখুন , বুখারী , আস-সহীহ ৩/১০৯৪, ৫/২২২৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫)

কিতালঃ

জিহাদের একটি বিশেষ পর্যায় হলো কিতাল । কিতাল অর্থ পারস্পরিক হত্যা বা যুদ্ধ । ইসলামী পরিভাষায় কিতালকেও জিহাদ বলা হয়।পারিভাষিক ভাবে কিতাল হলো সেই জিহাদ যেখানে শত্রুরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ । জিহাদ "ধর্মযুদ্ধ" বা "পবিত্র যুদ্ধ" নয় বরং এর অর্থ "রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ" ।

জিহাদের শর্তঃ

জিহাদ বা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের জন্য চারটি শর্ত আছেঃ

১) জিহাদের প্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব । রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পূর্বে , ইসলাম জিহাদের অনুমতি প্রদান করে নি । রাসুলুল্লাহ সাঃ সম্পুর্ণ শান্তপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচার বা দাওয়াতের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং এভাবে এক পর্যায়ে মদীনা শরীফের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহন করেন এবং রাসুল সাঃ কে তারা তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহন করেন । এভাবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় । কাফিরগণ এ রাষ্ট্রটিকে গলাটিপে মেরে ফেলার জন্য চারিদিক থেকে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় । তখন আল্লাহ যুদ্ধের অনুম তি প্রদান করে বলেনঃ " যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারন তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।" (সুরা হজ্জ ২২: আয়াত ৩৯) এ আয়াত থেকেই আমরা জিহাদের ২য় শর্ত জানতে পারি।

২) জিহাদের দ্বিতীয় শর্ত হলো আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হওয়া। যখন মুসলিম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের নাগরিকগণ অন্য কোনো আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হবেন অথবা এরূপ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রকাশিত হবে তখনই কিতাল বৈধ হবে।
৩)জিহাদের তৃতীয় শর্ত হলো রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ও নেতৃত্ব। কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জিহাদের ঘোশনা বা অনুমতি প্রদান করতে পারবে না। এ বিষয়ে রাসুল সাঃ বলেন- " রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল , যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে" (বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১)
৪) জিহাদের চতুর্থ শর্ত হলো , শুধু সশস্ত্র শত্রুযোদ্ধাকের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন-" তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করো তাদের সাথে যারা তমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু সীমা লঙ্গন করবে না , আল্লাহ সীমালঙ্গনকারীগনকে ভালোবাসেন না " (সূরা বাকারা ২: আয়াত ১৯০)
এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা , অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বা গোষ্ঠীয় সকল সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছেন। এমনকি যোদ্ধা টার্গেটের বিরুদ্ধে সীমালঙ্গন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
রাসুল সাঃ বলেন- " যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রানীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না , কোনো শিশু কিশোরকে হত্যা করবে না , কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না , কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না , কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না , কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না , কোনো জনপদ ধবংশ করবে না , খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু , উট বা কোন প্রানী বদ করবে না , যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোন গাছ কাটবে না ..... " (বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/৯০)

ইসলামে মানুষ হত্যা করা কঠিনতম পাপ। একটি মানুষের জীবন বাচাতে যেমন তাঁর কোনো অঙ্গ সার্জারির মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয় , তেমনি মানব সমাজকে বাঁচাতে একান্ত বাধ্য হয়ে দুটি পথে মানুষ হত্যার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
১) বিচারের মাধ্যমে
২) যুদ্ধের ময়দানে
এক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো যথা সম্ভব হত্যা পরিহার করা।
জিহাদের শর্তগুলি পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদের নামে অস্ত্র ধারন করে বা হত্যা করে তবে সে ব্যক্তি কঠিনতম পাপে লিপ্ত হলো।
আল্লাহ বলেন- " অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সামিল" (সুরা আল-মায়িদাঃ৩২)
" যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন, তার উপর লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন" (সূরা নিসা, আয়াত ৯৩)

আর জিহাদের সকল শর্ত পূরন হওয়ার পরেও যদি কেউ জীবনেও জিহাদ না করে , তাহলে তাঁর কোনো গোনাহ হবে,তিনি ফরজ তরকের গুনাহ করবেন । তিনি জিহাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে ।
আল্লাহ বলেনঃ " মুমিনের মধ্যে যারা কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান হন না। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন । উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ..... " (সূরা নিসা । আয়াত ৯৫)

সন্ত্রাসঃ
সন্ত্রাস শব্দটি ত্রাস থেকে উদ্ভূত ।
ত্রাস হলো ভয়, শংকা , ভীতিকর (সংসদ বাঙ্গালা অভিধানঃ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিতঃ কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৪,পৃষ্ঠা ৩১৭)
আর , সন্ত্রাস হলো আতন্ত্রগ্রস্ত করা , অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। সন্ত্রাসিত-সন্ত্রাসযুক্ত , সন্ত্রস্ত ((সংসদ বাঙ্গালা অভিধানঃ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিতঃ কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৮৪,পৃষ্ঠা ৬৬১)
যারা সন্ত্রাসী করে তাদের Terrorist বলা হয় । আর সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি হলো সন্ত্রাসবাদ যাকে ইংলিশে Terrorism বলে ।
কুরানের পরিভাষায় সন্তাসিদেরকে " মুহারিবুন" বলা হয়েছে (আল-মাআনাশ শরহে লিকারিবীন ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩)
পবিত্র কুরান ও সুন্নায় সন্ত্রাসবাদ বলতে ফিতনা এবং ফাসাদ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে ।
আল্লাহ বলেন- " পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না " (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬)
" ফিতনা (সন্ত্রাস) নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ " (সূরা আল-বাকারা , আয়াত ২১৭)
" ফিতনা (সন্ত্রাস) হত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ " (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৯১)
বিদায় হজ্জের ভাষনে রাসুল সাঃ বলেছেনঃ প্রতেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত , ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম" (মুসলিম , ৪র্থ খন্ড , পৃষ্ঠা ১৯৮৬ , ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল , বিদায় হজ্জের অভিভাষন অধ্যায় ,প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ ২০১১)
" সাবধান ! ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে না । কেননা ধর্মের সঠিক বন্ধনসমূহ অতিক্রম করার ফলে তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে " (ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল , বিদায় হজ্জের অভিভাষন অধ্যায় ,প্রকাশকঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ ২০১১)
দূর্ভাগ্যজনক ভাবে কিছুলোক মুসলিমদের টেরোরিস্ট বা সন্ত্রাসী আর ইসলামকে টেরোরিজম এর সমার্থক প্রচার করে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছেন । তারা ইসলামের বিধান

জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে তুলনা করেছেন । সকল মুসলিমকে ঢালাওভাবে " সন্ত্রাসী/টেরোরিস্ট" হিসেবে আখ্যায়িত করছে ।
জিহাদ শব্দটির অপব্যখা করে দীর্ঘদিন থেকে জিহাদকে উম্মাদনার প্রতিশব্দে পরিণত করেছে । অনেকে জিহাদের নাম দিয়েছে " ইসলামী সন্ত্রাস" !
আবার কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ,নিজ গোষ্ঠী জিহাদের অর্থকে সম্পূর্ণ বি কৃত রূপ দিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলামকে কলুষিত করছে ।
এখন প্রশ্ন হলো , জিহাদ ও জঙ্গিবাদ তথা সন্ত্রাস কি সমার্থক? জিহাদ ও সন্ত্রাস কখোনো সমার্থক হতে পারে না । আল্লাহর বিধান পালন করতে সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে আভিধানিক ভাবে জিহাদ বলে । অন্যদিকে সন্ত্রাস হচ্ছে এমন এক নিকৃষ্ট অপকর্ম , যা মূলতঃ হত্যার চেয়েও জঘন্য হিসেবে বিবেচিত (দেখুন সুরা বাকারা , আয়াত ১৯১)
ইসলামের সত্য হচ্ছে , শান্তি প্রতিষ্ঠা , ইসলামের এই সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করতে মিথ্যার পূজারীরা প্রতিনিয়ত চেষ্ঠা করছে । এর কারন কি ? কারন হলো " ইসলামের আলো সহজেই মানুষকে আকৃষ্ঠ করছে"
১৯৭৯ সালের ১৬ ই এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি আর্টিকেল উল্লেখ করেছিল যে, বিগত দেরশ বৎসরে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে ৬০ হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে । এছাড়াও টেলিভিশন, সিনেমা ইলেকট্রনিক গেম, ওয়েব সাইট , ব্লগ , ফেসবুক , ইউটিউব , সোশ্যাল মিডিয়ার সকল মাধ্যম ইত্যাদি অগনিত প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল প্রপাগান্ডা চালান হয় তাঁর অন্যতম বিষয় হলো জিহাদ।
জিহাদ বিষয়ে অনেক মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালানো হয়। যেমন বলা হয়, ধর্মই সকল হানাহানির মূল, ধর্মের নামেই রক্তপাত হয়েছে সবচেয়ে বেশি । কি জঘন্য মিথ্যাচার। তবে এতা ঠিক যে, অনেক সময় ধর্মকে হানাহানির হাতিয়ার বানানো হয় । তবে ইসলাম ধর্মের নামে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ , দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , কমুনিষ্ট চীনের সাথে কম্যুনিস্ট ভিয়েতনামের যুদ্ধ । আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ মরেছে । মম্পুচীয়ায় খেমার রূজের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভয়ংকর মৃত্যু , জোসেফ স্টালুনের নির্দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের হত্যা , মাওসেতুং-এর চীনে প্রায় দু কোটি মানুষের হত্যা , মুসোলিনির নির্দেশে ইটালির ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও এরূপ অগনিত মানুষের হত্যা কোন ইসলামের নামে হয়েছে?
তারা বলছে , একমাত্র ইসলাম ধর্মই জিহাদের কথা বলেছে । কি মিথ্যা কথা !! হিন্দুদের মহাভারত ও রামায়ন পুরোটা যুদ্ধ নিয়ে । গীতার যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে । বাইবেলে বারংবার যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলার যিশুখৃস্ট তাঁর সকল শত্রুকে ধরে ধরে জবাই করতে নির্দেশ দিয়েছেন (বাইবেলঃ লুক ১৯/২৭) । যুদ্ধে উধবুদ্দ করে তিনি বলেন , আমি তরবারী নিয়ে এসেছিঃ Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace , but a sword (বাইবেলঃ মথি ১০/৩৪)।

বাইবেলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষ হত্যা, বাড়িঘর কৃষিক্ষেত ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তাঁর সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারীদের ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সে দেশ যদি ইহুদীদের বসবাসের কোনো দেশ হয় তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রানী হত্যা করতে হবে। (বাইবেল, গননাপুস্তক ৩১/১৭-১৮; দ্বিতীয় বিবরন ২০/১৩-১৬)
বাইবেলের যিহোশূয়ের পুস্তক , বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরন , শমুয়েলের পুস্তক , রাজাবলির , বংশাবলি ইত্যাদি পাঠ করলে বর্বর গনহত্যা , কল্পনাতীত নিপিড়ন , উন্মাদ ধবংশযজ্ঞের লোমহর্ষক ঘটনাবলি দেখা যায়।
যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়াতে ক্রুসেড (Crusade) , এলবিজেনসিয়ান ক্রুসেড ,সেন্ট বার্থলমিউস দিবসের গণহত্যা (Massacre of saint Bartholomew's Day) , ইনকুইজিশন , ধর্মের যুদ্ধ ইত্যাদি আর্টিকেল পড়লেই অনেক তথ্য জানা যায়। যদিও আধুনিক এনসাইক্লোপিডিয়াতে বিষয়গুলিকে খুবই হালকা করা হয়েছে এবং নিহতদের সংখ্যা কম করা হয়েছে , তবুও যেটুকু সত্য দেখা যায় তাতেই গায়ের লোম শিউরে উঠে! এ হলো ইহুদী - খৃস্টানদের একেকটি ধর্মযুদ্ধের অবস্থা। মহাভারত , গীতা ও রামায়ণের যুদ্ধেরও কাছাকাছি অবস্থা।

.

ইসলামের জিহাদ নিয়ে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো , মুসলিমরা ধর্মপ্রচার বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে বা ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে। এটি মিথ্যা ও প্রকৃত সত্যের সম্পুর্ন বিপরীত তথ্য। বস্তুত বাইবেলে ধর্মের কারনে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার , দেশের বিধর্মী নাগরিকদের দাওয়াতের নামে ডেকে এনে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার ও নিরিহ বিধর্মীদের ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (বাইবেল, ১ রাজাবলি ১৮/৪০,২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮) । ৩২৫ খৃস্টাব্দে বাইযেন্টাইন সম্রাট কনস্টান্টাইন খৃস্টধর্মকে রাস্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খৃস্টান চার্চ, পোপ, প্রচারক ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হলো রক্তের ইতিহাস। অধার্মিকতা বা heresy দমনের নামে , ধর্ম প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা , পরধর্মের প্রতি বিষোদগার , জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ , অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা , নির্যাতন বা জিবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান ধর্মের সুপরিচিত ইতিহাস।

.

পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে , ধর্ম প্রচারের জন্য নয়। ইসলামে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনোই অমুসলিম হওয়ার কারনে কাউকে হত্যা করা হয়নি বা জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর চেষ্টা করা হয়নি। আল্লাহ বলেন- " ধর্মের মধ্যে কোনো জোর যবরদস্তি নেই " (সূরা বাকারা , আয়াত ২৫৬)
রাসুল সাঃ বলেন- " যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না , যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০

বৎসরের দূরত্ব থেকে লাভ করা যায় " (বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৫৫ , ৬/২৫৩৩; মুসলিম , আস-সহীহ ৪/২২৭৮)

.

যুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া ও অন্য যে কোনো ইতিহাস বা বিশ্বকোষ থেকে জানা যায় যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খৃস্টান দেশে ইহুদিদের উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে , জোর পূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে , নানাভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে । অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহুদীরা পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছে । আজ এ বর্বরতার অনুসারী ও উত্তরসূরীরা তাদের বর্বরতা ঢাকতে ইসলামের জিহাদকে সন্ত্রাস বলে অপ-প্রচার চালাচ্ছে।

.

দেড় হাজার বছর ধরে মুসলিমগণ আরববিশ্ব শাসন করেছেন । সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্ট্রান ও কয়েকলক্ষ ইহুদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে ।

.

ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন , সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু । অথচ খৃস্ট্রানগন যে দেশই দখল করেছেন, জোর যবরদস্তি করে বা ছলে বলে সে দেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন ।

.

ইসলাম যদি তরবারির জোরেই প্রচারিত হবে তাহলে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিমপ্রদান দেশ হয় কি করে ? সেখানে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি । বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম হলো সর্বাধিক বর্ধনশীন ধর্ম । ইউরোপ আমেরিকা সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহন করছে । কোন তরবারীর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহন করছেন?

.

জিহাদ বিষয়ে অন্য বিভ্রান্তি হলো , জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করা । সন্ত্রাস বা টেরোরিজম হলো - অবৈধভাবে সহিংসতা ব্যবহার করে সরকার বা জনগনকে ভীত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা হলো সন্ত্রাস । এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও অন্যান্য গ্রন্থে এমনই বলা হয়েছে । যেখানে বৈধ ও অবৈধতা খুবই অস্পস্ট । ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে , বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ছিলো দখলদারদের নিকট সন্ত্রাসী । বর্ণবাদী আফ্রিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতা নেলসন মেন্ডেলা আমেরিকার দৃষ্টিতে ছিলেন সন্ত্রাসী । নেপালের মাওবাদিরা ছিলো অন্যদের নিকট সন্ত্রাসী ।

দাওয়াহ দেয়ার পদ্ধতি

এখানে কিছু দাওয়াহ দেয়ার বাস্তবিব পদ্ধতি কেমন হতে পারে তার কয়েকটি নমুনা তুলে ধরার চেস্টা করা হলো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কবুলযোগ্য দাঈ উম্মাহ হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহুমাহ আমিন

সুদ

১/ বিষয়: সুদ কেন হারাম? আগের সুদ এই সুদ এক না। ব্যাংকে খেটে সৎভাবে পরিশ্রম করে ইনকাম করি তবে কেনো ব্যাংকের চাকুরী হারাম হবে? সুদের সহিহ দলীল কি? এর শাস্তি কি? শুকরের মাংস খাওয়াও কি হারাম? সবাই তো সুদের ওপর চলছে তাহলে আল্লাহ কি বুঝবেন না? সুদের টাকা দিয়ে বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে... সুদের টাকায় হজ্জ করা যাবে?

(আমাতুল্লাহ ও সোনিয়ার মাঝে কথোপকথন। তারা দুইজনই দীনের পথে নতুন হাটছে। তারা দুইজনই দুইটা কনভেনশনাল ব্যাংকে চাকুরি করছে। আমাতুল্লাহ সুদ/রিবা নিয়ে পড়াশুনা করে রিজাইন দিয়ে প্রিয় বান্ধুবে জানাতে যাচ্ছে)

আমাতুল্লাহ: আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ
সোনিয়া: ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আমাতুল্লাহ: যোহরের সলাত আদায় করে এসেছো?
সোনিয়া: আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ করে এসেছি। কেমন আছো তুমি?

আমাতুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। একটা সুখবর দিতে এলাম সামনা সামনি দিবো আর দীনি বোনের সাথে মোলাকাতও হয়ে যাবে, তাই এলাম আলহামদুলিল্লাহ। তোমার শরীর ভালো আছে?
সোনিয়া: আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছি। বলে ফেলো কি সুখবর?

আমাতুল্লাহ: ২টা সুখবর আমি নিকাব শুরু করেছি। এখন শুধু বাইরে পড়ি না এখন বাসায়ও নন-মাহরামদের সামনেও নিকাব ছাড়া যাচ্ছি না এবং যাবো না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আরেকটা বড় সুখবর আমি হারাম চাকুরিটা ছেড়ে দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

সোনিয়া : আলহামদুলিল্লাহ নিকাব শুরু করা তো অনেক সাহসী সিদ্ধান্ত কিন্তু তুমি নিজের এত ভালো চাকুরিকে হারাম কেনো বলছো? আর এত ভালো চাকুরীটা ছেড়ে দিলে? আমার সাথে কি মজা করছো?

আমাতুল্লাহ: এই দেখো আমার resignation letter এর received copy.
সোনিয়া: কি বলছো তুমি, আমাতুল্লাহ! আমি আরো ভাবছিলাম তোমার ওখানে একটা vacancy দেখলাম ভালো পোস্টে apply করবো, এটা নিয়ে আজ তোমার সাথে কথা বলবো। জানোই তো আমার ব্যাংকে আমার এই পোস্টে বেতন অনেক কম, তোমার ওখানে ভালো বেতন দেয় পরিবেশও খুব ভালো। কি সুন্দর তোমরা IT তে মেয়েরা সব আলাদা বসও, শুধু পিসিতে কাজ করতে হয় ছেলেদের সাথে বেশি দেখাও হয় না। আমার খুব ভালো লেগেছে তোমার চাকুরিটা। এই চাকুরিটা ছেড়ো না প্লিজ। বেশ ভালো বেতন দেয়। তোমাদের পরিবারের এই অবস্থা তার ওপর তুমি বড় মেয়ে ভাই নাই। প্লিজ চাকুরিটা ছেড়ো না।

আমাতুল্লাহ: ঠিক বলেছো এখানে পরিবেশ অনেক ভালো। client handle করতে হয় না শুধু software based কাজ করতে হয় head office এ। মেয়েরা আদালা বসি এমন পরিবেশ খুব কম জায়গায়তেই আছে।
সোনিয়া: ছেড়ো না প্লিজ...

আমাতুল্লাহ: সোনিয়া, শুনো আসলে বেতন বেশি দিয়ে কি করবো বলো। এই চাকুরি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে আমার অনেক কস্ট হয়েছে। কিন্তু হারামে অর্থে যে ইবাদাত কবুল হয় না। তুমি কি চাও আমার কোন ইবাদাত দোয়া কবুল না হোক। আল্লা হ তো আমার রিযিক নির্ধারিত করে রেখেছেন। হারাম ভাবে না নিলে অবশ্যই এই রিযিকই আল্লাহ হালালভাবে দিবেন অবশ্যই দিবেন। পাখিকে আল্লাহ রিযিক দেন। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল কর তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেন সেভাবে তোমাদেরও রিযিক দেবেন। পাখিরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"
(সহীহ - এটি ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন।)
সোনিয়া: আচ্ছা তাই তো এভাবে ভাবী নি।

আমাতুল্লাহ: এখন আল্লাহ যদি রিযিক লিখে রাখেন আর আমাকে চয়েজ দেন আমি হালাল ভাবে নিবো নাকি হারাম ভাবে এটা আমার ওপর। তাহলে?
সোনিয়া : আল্লাহ তাই তো...কিন্তু তোমার কথায় লজিক আছে। আমার মাথায় কাজ করছে না একটা ব্যাপার, সারাদিন খেটে সৎভাবে পরিশ্রম করে ইনকাম করছি এটা কেনো হারাম হবে? তাহলে তো দুনিয়ার কেউ চলতেই পারবে না। ব্যাংক ছাড়া তুমি চলতে পারবে বলো?

আমাতুল্লাহ: সোনিয়া, তুমি আগে ঠান্ডা মাথায় বস। কি খাবে চলো আগে সেটা অর্ডার দেই এরপর কথা বলি।
(খাবার চলে এসেছে খেতে খেতে কথা বলছে...)
সোনিয়া: বাসার সবাই মেনেছে? আন্টি আংকেল? আরে আমিই তো মানতে পারছি না। আমিও তো ব্যাংকেই চাকুরি করি কেউ তো কোনদিন আমাকে বলে নাই এই চাকুরী হারাম?

আমাতুল্লাহ: আমাকেও বলে নি। সবর করও করো একটা একটা করে সব বলবো। আগে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও
সোনিয়া : কি বলো?

আমাতুল্লাহ: আচ্ছা আমাকে একটা প্রশ্ন এর উত্তর দাও তো, "চোর, ডাকাত তারাও তো পরিশ্রম করে ইনকাম করে, তাহলে তাদেরটা হারাম হবে কেন?"
সোনিয়া: ওরা তো অন্যকে ধোকা দিয়ে অর্থ লুট করছে। এটা তো অবশ্যই খারাপ। তাছাড়া আল্লাহ স্পস্টত চুরিকে মানা করেছে, হারাম বলেছে। আল্লাহ মানা করেছেন তা তো করা যাবে না।

আমাতুল্লাহ: বাহ...মাশাল্লাহ! তোমার সাথে কথা বলতে আমার খুবই ভালো লাগে৷ আল্লাহর সম্পর্কে তোমার ধারণা খুবই উত্তম। এই ব্যাপারে আমি তোমার থেকে শিখি। আমরা একসাথে চাকুরিতে ডুকি, একসাথে হিজাব, বোরখা শুরু করি, আমাদের মানসিকতার অনেক মিল আলহামদুলিল্লাহ, তাই তোমার সাথে কথা বলে আমি অনেক শুকুন পাই। আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক পরম বন্ধ তুমি আমার।
সোনিয়া: আলহামদুলিল্লাহ তুমিও আমার পরম বন্ধু।

আমাতুল্লাহ: শুনো, যেভাবে চোর ডাকাতের উপার্জনের উত্তর তুমিই দিলে ঠিক ওইভাবেই সুদী ব্যাংকের চাকুরিও হারাম। আর আশেপাশের মানুষের কথা বলছো! দেখো আমরা ছোট বেলা থেকে অংকে সুদ আসলের হিসেব করেছি তাই সুদ আসল আমাদের কাছে স্বাভাবিক মনে হয় এবং এর হিসেব ভালো বুঝি। কিন্তু যাকাতের হিসেব আমরা শিখি নি তাই যাকাত কম বুঝি, বা হিসেব জটিল লাগে। সবকিছু অনেক বড় পরিকল্পনার অংশ।
সোনিয়া: আচ্ছা তোমার কথায় লজিক আছে। কিন্তু এখনকার সুদ তো তখনকার সুদ না। এই সুদ কেনো হারাম হবে?

আমাতুল্লাহ: সবার আগে আল্লাহ বলেছেন তাই হারাম। আচ্ছা বলো শুকরের মাংস খাবে তুমি? ওটা তো দুনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ খায় মুসলিমরা বাদে।
সোনিয়া: ছি ছি: শুকরের মাংস শুনলেই তো ঘেন্না লাগে। এর ভক্ষণে অনেক রোগ হয় আবর্জনাতে থাকে, আবর্জনা খায়, হাগুও খায়, ছি: ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে ঘেন্না লাগে এদের দেখলেই।

আমাতুল্লাহ: বাহ মাশাল্লাহ! দেখো তুমি আমি কোনদিন শুকরের মাংস খাই নি আল্লাহ হারাম বলেছেন তাই। একটু চেখে খাওয়ার কথা চিন্তাও করি নি কোনদিন তাই না?
সোনিয়া: হ্যাঁ অবশ্যই। সবার কাছ থেকে ছোট বেলায় শুনেছি।

আমাতুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ দেখো আমরা ছোটবেলায় যা শুনি, দেখি তা আমাদের মাথায় ঘেথে যায়। এটাই আমাদের চ্যালেঞ্জ আমরা এমন প্রজন্ম গড়বো যারা ছোটবেলা থেকেই জানবে আল্লাহ যা যা করতে মানা করেছে তা কোনভাবেই করা যাবেই না ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তাউফিক দান করুক আমিন।
সোনিয়া : আমিন।

আমাতুল্লাহ:শুকরের মাংস খাওয়া হারাম এটা আল্লাহ কোরয়ানেই বলে দিয়েছেন এ নিয়ে একাধিক আয়াত আছে। ঠিক তেমনি সুদ যে হারাম এটাও আল্লাহ কোরয়ানে স্পস্টভাবে বলে দিয়েছেন। এবার আসো আমরা সুদের মাধ্যমে কিভাবে ধোকা দিচ্ছি মানুষকে সে বিষয়ে।
সোনিয়া: বলো আমি মন দিয়ে শুনছি।

আমাতুল্লাহ: সুদকে আল্লাহ এ কারণেই হারাম করেছেন যে, এর মাধ্যমে অভাবীদের অভাবকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানো হয়, একজন গরিব লোকের ওপর অধিকহারে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। এছাড়াও সমাজে সুদের প্রচলনের কারণে পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয়, বিশৃংখলা, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, খুন-খারাবি ব্যাপকহারে সংঘটিত হয়। সুদের প্রচলনের কারণে মানুষ কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়। তারা সুদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে তারা জমিনে ফসল ফলানোর জন্য কোনো পরিশ্রমকরে না। এসব ছাড়াও সুদের রয়েছে আরো অনেক ক্ষতিকারিতা। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন:
“যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসরকরে মোহবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে: ক্রয়-বিক্রয় তো সুদ নেয়ার মতই। অথচ আল্লাহ তা’আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপর আল্লাহর উপর নির্ভশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযথে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহপাক সুদকে নিশ্চহ্ন করেন এবয দান খায়রাতকেবর্ধিত করেন। আল্লাজ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।” (সূরা বাকারাহ: ২৭৫-২৭৬)
সোনিয়া :আল্লাহ আমি তো দেখি কোরয়ানের কিছুই জানি না। আর এত গভীরভাবে কখনো চিন্তা করি নি তো! সবাই ব্যাংকের চাকুরিকে বাহবা বলে, সরকারী চাকুরির পরেই ব্যাংকের চাকুরিকে বাহবা দেয়।

আমাতুল্লাহ: কারণ তারা জানে না। ছোটবেলা থেকে মগজে সুদের হিসেবের অংক করতে করতে ডুকে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদের জানার সুযোগ দিয়েছেন। এখন আমরা দাঈ জাতি আমাদের এই দাওয়াত সবার কাছে পৌছে দিতে হবে, যারা জানে না।
সোনিয়া: ঠিক বলেছো আমার এখন খুব খারাপ লাগছে। আমাকে কেউ কোনদিন বলেই নি। হিজাব করি, নামাজ পড়ি,রোজা রাখি কিন্তু কোরয়ানের অর্থই জানি না আল্লাহ কি বলেছেন। লজ্জা লাগছে। কেউ বললে এই চাকুরিতে ডুকতাম না হয়তো!

আমাতুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ এই রিয়েলাইজেশনটা যে আল্লাহ তার কাছে চলে যাওয়ার আগে দিয়েছেন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ। অনেকে এই অনুভুতি ছাড়াই আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এরজন্য শুকরিয়া আদায় করে আমাদের ব্যাপকভাবে উম্মাহর খেদমতে কাজ করতে হবে।
সোনিয়া: ঠিক বলেছো। কিন্তু আমার আর কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরছে বলও তো যদি তোমার জানা থাকে। যারা সুদ খায় তাদের পরিনামও কি কোরয়ানে বলা আছে?

আমাতুল্লাহ: যারা সুদ খেয়েছে তাদের তাওবা করে তা থেকে বিরত থাকতে আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে:
“হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক। অত:পর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।” (সূরা বাকারাহ: ২৭৮-২৭৯)
সোনিয়া: ইন্না লিল্লাহ। আসতাগফিরুল্লাহ। কি বলছো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ!! (দুইজনই কান্না করে দিয়েছে এখন...)

আমাতুল্লাহ: সোনিয়া, এই আয়াতটা আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না যখন থেকে আল্লাহ জানিয়েছেন। "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ " নাউযুবিল্লাহ চিন্তাই করা যায় না। আমি রাতের পর রাত ঘুমাতে পারি না। শুধু কান্না করি। যুদ্ধ তাও আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে!!

এ নিয়ে রাসূল সা: এর অনেক হাদিসও আছে। তাছাড়া রাসূল (স:) সুদের সম্পৃক্ত চার প্রকারের লোককে অভিসম্পাত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবেনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“রাসূল (স:) সুদগ্রহীতাকে, সুদদাতাকে, সাক্ষীদাতাকে এবং লেখকে অভিসম্পাত করেছেন”
(হাদীসসহীহ/ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)
উপরোক্ত হাদিস মতে সুদী ব্যাংকে চাকরী করা হারাম।
আল্লাহ(সুব.) আমাদেরকে সত্য মেনে নেয়ার তাওফিক দিন-আমীন।

সোনিয়া: ইন্না লিল্লাহ...আমার বাবাও জনতা ব্যাংকে চাকুরি করতেন আল্লাহর কাছে চাকুরি করেই চলে গিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহ!!!

আমাতুল্লাহ: আল্লাহ আংকেলকে ক্ষমা করুক আমিন। আর দেখো আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন সুযোগ দিয়েছেন আল্লাহ কতই না মেহেরবান আমাদের উপর আলহামদুলিল্লাহ।
সোনিয়া: আমার আংকেলও সুদের ওপর টাকা নিয়ে বিদেশে গিয়ে চাকুরি করে টাকা পয়সা কামিয়েছেন, সেটা টাকা কি হালাল হবে? সে টাকা দিয়ে হজ্জ করলে হজ্জ আদায় হবে?

আমাতুল্লাহ: আমিও তো এইগুলো নিয়ে পড়াশুনা করছি। দলীল আর আলেমদের মতবাদ ছাড়া কথা বলার দু:সাহস আমার নেই। আমি একজনের উত্তর কপি করে বলার চেস্টা করছি।
সুদ নেওয়া এবং দেওয়া উভয়টাই ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।
এতদসত্ত্বেও যদি কেউ সুদের ওপর টাকা নিয়ে বিদেশ গিয়ে হালালভাবে টাকা উপার্জন করে তাহলে তার উপার্জিত টাকা হালাল হবে। আর ওই সফরে হজ করলে হজও আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের ওপর টাকা নেওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে তাওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। (মুসলিম, হাদিস : ১৫৯৮, নিজামুল ফাতাওয়া : ১/১৮৯y)
সোনিয়া: আমার মনে হচ্ছে চাকুরিটা ছেড়ে দেয়া জরুরি তোমার রিজাইন লেটারের কপি আমাকে দাও আমিও লিখে সাবমিট করবো। আর এই দলিলগুলো আমাকে লিখিত দাও বাসায় দেখাবো। কাল যদি মরে যাই, আমিও যদি বাবার মত সুযোগ না পাই!!

আমাতুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তোমাকে কবুল করুক। আমাদের এই চেস্টাকে কবুল করুক। আমি সব দিবো, তুমি কাল বাসায় আসো সব দিবো ইন শা আল্লাহ।
সোনিয়া: বসে থাকার সময় নেই। অনেক উপকার করলে আমার।

আমাতুল্লাহ: আমি করি নি। আল্লাহ চেয়েছেন দেখেই আল্লাহ আমাদের উপকার করেছেন। এখন আমাদের এই নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করে সবাইকে দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ ভোলা মানুষকে আল্লাহর পথে নিতে হবে। আল্লাহ আমাদের দুইজনকে কবুল করুক। আমাদের দাঈ হিসেবে কবুল করুক। ফিরে আসার এই সুযোগকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে।
সোনিয়া: আমিন। আমি যাই দ্রুত কাল বাসায় আসছি ইন শা আল্লাহ। আর আমার জন্যও একটা নিকাব কিনো।

আমাতুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ (জড়িয়ে ধরে দুইজন কাদলো এবং বিদায় নিলো।) আল্লাহ আমাদের দুইজনকে জান্নাতেও একসাথে রাখুক আমিন।
সোনিয়া : আমিন।

২/ বিষয়: সুদমুক্ত অর্থনীতি

আবদুল্লাহঃ তাপশ ভাই কোথায় যাচ্ছেন?
শেখ তাপশঃ সোনালি ব্যাংকে যাচ্ছি। একটা ফিক্সড ডিপোজিট খুলেছিলাম।সেখান থেকে কিছু টাকা তুলবো।
আবদুল্লাহঃ তাপশ ভাই এসব ব্যাংকে লেনদেন তো হারাম।এখানে তো সুদের লেনদেন হয়।
তাপশঃ তো?সুদের লেনদেন তো সব ব্যাংকেই হয়।
আব্দুল্লাহঃ আপনি জানেন না ইসলামে সুদ হারাম।আর কেন ইসলামে সুদ কেন হারাম?
তাপশঃ না,সম্পূর্ণভাবে জানি না।
আবদুল্লাহঃ তাহলে শুনুন- ইসলামে রিবা বা সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম। মহান আল্লাহ তাআলা সুদকে হারাম করেছেন এবং ব্যবসাকে হালাল করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করা সুন্নাহ আর সুদের কারবার করে অর্থ উপার্জন করা সম্পূর্ণ হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' (সুরা বাকারা : আয়াত ২৭৫)
সুদ হারাম হওয়ার কারণ হলো - সুদের যে অতিরিক্ত অর্থ আসে তার জন্য মেধা ও শ্রম ব্যয় করতে হয় না। সময় শেষে তা থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়। এতে যে ব্যক্তি কর্জ গ্রহণ করে; ওই ব্যক্তির জন্য অতিরিক্তি অর্থ আদায় করা 'জুলুম'।,পবিত্র কোরআনে সুদভিত্তিক কর্মকাণ্ডে জড়ানোকে আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের বকেয়া যা আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা না ছাড়ো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' (সুরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯)

তাপশঃ বলেন কি?
আবদুল্লাহ : জ্বি ভাই।সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির অনেক কুফল রয়েছে।
তাপশঃ সুদভিত্তিক অর্থনীতির কুফল কি কি?
আবদুল্লাহঃ সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির অনেক কুফল রয়েছে। তারমধ্যে কয়েকটি বলছি-
১)সমাজে শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে সুদ। একদল লোক বিনা শ্রমে অন্যের কষ্টার্জিত উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা নেয়, সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক, তাকে সুদের অর্থ পরিশোধ করতেই হয়।
২)সুদের কারণে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে, গরিবেরা গরিব হতে হতে একপর্যায়ে চরম অসহায়ত্বের পর্যায়ে চলে যায়। এর ফলে অনেকে আত্মহত্যা কিংবা বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।
৩)সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য তথা উৎপাদন খরচ, পরিবহন খরচ, শুল্ক ও স্বাভাবিক মুনাফার ওপর উপর্যুপরি সুদ যোগ হতে থাকে। এর ফলে দ্রব্যমূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। গত শতকের চল্লিশ দশকে জার্মান বিশেষজ্ঞ প্রাচ্যবিদ "জোসেফ শাখত"

সুদ নিয়ে একটি আর্টিকেল প্রকাশ করেন।সেখানে তিনি লিখেছেন - সুদের নিশ্চিত ফলাফল হলো,স্বল্প কিছু ব্যক্তির হাতে অর্থ বৃদ্ধি পাবে,যাদের সংখ্যা ধারাবাহিক কমতে থাকবে।বহু মানুষ দরিদ্র হবে,যার সংখ্যা ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

তাপশঃ তাহলে নিশ্চয় সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতির সুফল ও রয়েছে, সেগুলো কি কি একটু জানাবেন ?

আবদুল্লাহঃ ইসলামি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হচ্ছে, পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। কারণ এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ জন্যই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, 'ধন-ঐশ্বর্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়।' (সুরা হাশর: ৭) ।

কিন্তু সুদের ফলে পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে একশ্রেণির মানুষের সম্পদ বিনা শ্রমে, বিনা উৎপাদনে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আরেক দিকে গরিব মানুষেরা প্রয়োজনীয় উৎপাদনের জন্য অমানুষিক শ্রম সত্ত্বেও দিন দিন আরও গরিব হতে থাকে।ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক, অনুরূপভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধান মেনে চলা আবশ্যক । অর্থনৈতিক জীবনে যাতে ভারসাম্য ক্ষুণ্ন না হয় এর জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে । গরীব যেন অনাহারে-অর্ধাহারে মারা না যায় সেজন্য যাকাত, উশর, খারাজ ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছে । এমনিভাবে ধনবৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মওজুদদারী, ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল ইত্যাদি উপার্জনের পন্থাকে হারাম করা হয়েছে । বস্তুত ইসলামি অর্থব্যবস্থায় কোনোরূপ যুলুম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই । মদীনার ইসলামি রাষ্ট্রে এর বাস্তবতা দেখা যায় । যে আরবের অধিবাসীরা একসময় বৈষম্য ও দারিদ্রের শিকার ছিল, ইসলামি অর্থনীতির স্পর্শে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাতে এমন পরিবর্তন সাধিত হলো যে, যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতোও কাউকে পাওয়া যেতো না ।

৩/ বিষয়: কোরয়ান সিলেবাস,মেয়েদের পর্দা, নারী সাক্ষী অর্ধেক কেনো? উত্তারিধিকারে নারী অর্ধেক কেনো, মুসলমানদের একমুখী দেখা যায় কেনো? ইসলামে এত ফিরকা বা দল কেনো?

আমাতুল্লাহ: আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ,সাবা।

সাবা: ওয়ালাইকুম আসসালাম।

আমাতুল্লাহ: কেমন আছো? বাসার সবাই ভালো আছে?
সাবা: হ্যাঁ, ভালো আছি। তুমি কোথাও যাচ্ছো?
আমাতুল্লাহ: একটা নিকাব কিনতে যাচ্ছিলাম।
সাবা: নিকাব! একটু বেশি হচ্ছে না? হিজাব পড়ছো এতেই তো আমার বেশি বেশি লাগছে।

আমাতুল্লাহ: আসলে আমরা ইসলামে আল্লাহ কি বলেছে কম জানি তো তাই এমন মনে হচ্ছে।

আমিও আগে জানতাম না। অথচ এইগুলো মুসলিম হিসেবে ছোটবেলা জানা ও মানার দরকার ছিল।

সাবা: মেয়েদের পর্দা নামক বিষয় দিয়ে ইসলাম কি দমিয়ে রাখে নি?পুরুষদের জন্য তো এমন কিছু নেই?

আমাতুল্লাহ: বাহ, আলহামদুলিল্লাহ তোমার প্রশ্নগুলো তুমি বলতে পারছো অনেকে পারে না। মাশাল্লাহ। এটা তোমার একটা আল্লাহর দেয়া গূণ। আসলে কি, সাবা! আমাদের মত মোডারেটেড ইসলামীক পরিবারে বড় হওয়া আর ১০টা মেয়েদের মতই সাধারণ প্রশ্ন। এইগুলো আমারও ছিল। আল্লাহর কাছে শুধু জানতে চাইতাম সঠিকটা জানাও, আল্লাহ তাউফিক দিয়েছেন, জানাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ। লা কুয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ।

সাবা: সাধারণ প্রশ্ন বলছো?

আমাতুল্লাহ: হ্যাঁ, তাহলে চলো পাশে কোথাও বসে কথা বলি যদি তোমার সময় থাকে, এরপর নিকাব কিনতে গেলাম ইন শা আল্লাহ।

সাবা: আচ্ছা চল। এখন আমি ফ্রি আছি। আমি প্রশ্নের উত্তরগুলো জানতে আগ্রহী।

আমাতুল্লাহ: ইসলামে দিয়েছে নারীদের উচ্চ মর্যাদা। নারী বেধে রাখা হয় নি বরং মর্যাদা মন্ডিত করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে পুরুষের জন্যই পর্দার আয়াত প্রথমে নাযিল হয়েছে। পরবর্তীতে নারীর পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছে। সুরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ্

বলেছেন, 'মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে।

মেয়েদেরকে যেমন পর্দার মাঝে থাকতে বলা হয়েছে তেমনভাবে নারীর প্রতি পুরুষদের দৃস্টি পড়লে কোন অসংগত ও নির্লজ্জ চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে,

এটার যেন সুযোগ না হয় তাই পুরুষকে তার দৃস্টিকে অবনত রাখতে বলা হয়েছে।

পুরুষই শুধু অবনত রাখবে এবং নারীরা পর্দাহীন চলাফেলা করবে এটা কোনভাবেই আল্লাহ অনুমতি দেন নি। উভয়ইকেই উভয়ের পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

আমাদের বানিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা, কোরয়ান পাঠিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা, এটাই আমাদের জীবন বিধান এই বিধান মেনে চলার মাঝেই আমাদের সাফল্য।

সাবা: কোরআনে আল্লাহ এইগুলো বলেছেন কি?

আমাতুল্লাহ: অবশ্যই বলেছেন। বলতে লজ্জা লাগে ২৫ বছর এ এসে কোরআনে এর অর্থ জানছি এতদিন কিছুই জানতাম না, খুবই লজ্জা লাগে। আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া আল্লাহ তো দেড়িতে হলেও জানার তাউফিক দিয়েছেন। কোরআন ও হাদিসে সব আছে।

সাবা: আহা! কোরআন তো আলমারীর উঁচু তাকে তোলা আছে কি আছে জানিই না। ছোটবেলায় শুধু পড়েছিলাম এক হুজুরের কাছে অল্প কয়েকদিন কিন্তু অর্থ না শুধু রিডিং।

আমাতুল্লাহ: আসলে এই কোরআনই আমাদের সিলেবাস জীবন ব্যবস্থা, যেমন ফ্রিজ এর ম্যানুয়ালে ফ্রিজ এর নিয়ম কানুন সব লিখা আছে। ঠিক তেমন কিভাবে আমরা চললে সফলকাম হবো সব আল্লাহ কোরয়ানে বলে দিয়েছেন। আচ্ছা আল্লাহ আছেন এটা তো বিশ্বাস করো?

সাবা: আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাস করি আল্লাহ এক এবং তিনিই সব করেন। কিন্তু আমার মনে অনেক নিয়ম কানুন নিয়ে প্রশ্ন মনের মাঝে তোড়পাড় করে। কাউকে বলতে পারি না, বলতে গেলে মুরুব্বিরা থামিয়ে দেয়।

আমাতুল্লাহ: তুমি আমাকে নি:সংকোচে বলতে পারো কারণ আমার নিজেরও অনেক প্রশ্ন ছিল। প্যারাড্রক্সিক্যাল সাজিদ বই দুইটা দিয়ে আল্লাহ আমাকে বেশ সাহায্য করেছে শুরুর দিকে। এরপর আল্লাহ এক এক করে সব প্রশ্নের উত্তর পাইয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

সাবা: এই বইয়ের নাম আগে শুনি নি। আচ্ছা তোমার থেকে নিয়ে পড়বো

আমাতুল্লাহ: অবশ্যই, যে আল্লাহর দিকে হেটে যায় আল্লাহ তার দিকে সাহায্য নিয়ে দৌড়ে আসেন।

সাবা: কি সুন্দর কথা!

আমাতুল্লাহ: আমার কথা না। হাদীসে এসেছে রাসূল সা: বলেছেন। আচ্ছা পর্দার আয়াতগুলো জানতে চাচ্ছিলে,

পর্দার আয়াতগুলো:

- সূরা নূর (সূরা নং ২৪: আয়াত নং ৩০,৩১)
- সূরা আযহাব (সূরা নং ৩৩: আয়াত নং ৫৯,৫৩,৩৬)
- সূরা নিসা (সূরা নং ৪: আয়াত নং ২৩)
- সূরা আ'রাফ (সূরা নং ৭: আয়াত নং ২৬)

তুমি অর্থগুলো ও তাফসীর পড়বে। এ্যাপও দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে আর বইগুলো আমাদের সবার বাসাতেই আছে কম বেশি।

সাবা: হ্যাঁ, সব তো আলমারীর উপরের তাকে উঠানো আছে। খুলেও দেখা হয় না।

আমাতুল্লাহ: সমস্যা নেই এখন হবে ইন শা আল্লাহ। late is better than never.

সাবা: নারীদের নিয়ে আমার আরো কিছু প্রশ্ন আছে। যেমন: নারী- পুরুষ সবাই সমান, তাহলে ২ নারীর সাক্ষ্য ১ পুরুষের সমান কেনো?

আমাতুল্লাহ: কোরআনে ৫টি আয়াতে (৫:১০৬,৬৫:২,২৪:২,৬) নারী-পুরুষের সাক্ষ্য এর ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয় নি শুধুমাত্র একটি আয়াতে পার্থক্য এর বিষয় এসেছে (২:২৮২)...

ইসলামে সম্পদের লেনদেনের আয়াতে (২ঃ২৮২) ইসলাম শুধু সমাজে এই পার্থক্য সমাজে পুরুষের দায়িত্বের পার্থক্য এত জন্য করা হয়েছে। পুরুষের দায়িত্ব বাবা মা,ভাই বোন,সন্তান, স্ত্রী সববেশি নারীর তুলনায় অনেক বেশি, যা উত্তরাধিকার এর প্রশ্নে (৩ নাম্বারে) আরো বিস্তারিত বোঝা যাবে।

এই আয়াতটি ইসলামে সম্পদের লেনদেন সম্পর্কিত আয়াত যা সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্য এর কারণে এসেছে।

* নারীর একক সাক্ষী অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য:

১। আয়েশা রা: এর মতে, একক সাক্ষী হাদিসের বিশুদ্ধতায় গ্রহণযোগ্য

২। চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন নারীর সাক্ষ্যই যথেস্ট

৩। নারীদের ব্যক্তিগত মাশায়ালার ক্ষেত্রে

৪। মহিলার মৃতদেহ গোসলের ক্ষেত্রে

সাবা: আচ্ছা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল।

আমাতুল্লাহ: কি জানতে চাচ্ছো? বলো জানলে বলবো আর না জানলে উস্তায থেকে জেনে জানাতে পারবো ইন শা আল্লাহ

সাবা: উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেনো?

আমাতুল্লাহ: নারীতা অনেক জায়গা থেকে পায়।

সাবা: গতানুগতিক উত্তর জানতে চাচ্ছি না। specific ভাবে বলো বাবা মা থেকে কেনো অর্ধেক পায়?

আয়াতুল্লাহ: ইসলামে নারীর ওপর কোন অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্ব নেই, যা ন্যস্ত আছে পুরুষের কাঁধে। বিয়ের আগে নারীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সব কিছুর দায়িত্ব থাকে পিতা ও ভাইদের ওপর। বিয়ের পরে উপরিউক্ত দায়িত্ব বর্তায় স্বামী ও ছেলেদের ওপর। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। এসব দায়দায়িত্ব পূরণ তাকে যোগ্য করে তোলার জন্য তাকে উওরাধিকারের অংশও দ্বিগুণ করে দেয়া হয়েছে।

সাবা: উদাহরণ দিয়ে বলবে প্লিজ?

আমাতুল্লাহ : আচ্ছা চেস্টা করছি। আল্লাহ যেন শুধু তাই বলান যা দ্বারা উপকার হবে। যেমন ধরো,এক লোক এক মেয়ে ও ছেলে রেখে ইন্তেকাল করলো, সাথে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা রেখে। এ অবস্থায় ছেলে পাবে ১ লাখ আর মেয়ে পাবে ৫০ হাজার। কিন্তু যেহেতু পুত্রের ওপর সংসারের সর্বপ্রকার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব আছে তাই ব্যয়ের পর দেখা গেলো পুত্রের ৮০ হাজার খরচ হওয়ার পর রইলো ২০ হাজার টাকা। আর মেয়ের কোন দায়িত্ব না থাকার গচ্ছিত রইলো ৫০ হাজার টাকা। এখন আপনাকে যদি কেউ ১ লাখ টাকা হাতে দিয়ে বলে ৮০ হাজার খরচ হয়ে যাবে এবং বাকি থাকবে ২০ হাজার টাকা, অপরদিকে ৫০ হাজার টাকা যার একটি টাকাও খরচ হবে না। তাহলে তুমি কোনটা নিবে?

সাবা: কোন বোকাও তো এই ক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা নিতে চাইবে না।

আমাতুল্লাহ: তোমার উত্তর পেয়েছো?

সাবা: আলহামদুলিল্লাহ একদম পানির মত পরিস্কার। ইস ছেলেদের কত দায়িত্ব! সে তুলনায় তো মেয়েদের দায়িত্ব অনেক কম।

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ ছেলেদের ফরজ দায়িত্ব অনেক বেশি মেয়েদের তুলনায়। মেয়েদের জন্য আল্লাহর কবুলযোগ্য হওয়া বেশি সহজ। সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আল্লাহ মেয়ে বানিয়েছেন।

সাবা: আমার তো অবাক লাগছে এইগুলো কিছুই জানতাম না। এভাবে কোনদিন ভাবিও না। আল্লাহু আকবার। আমার এখন অনেক ভালো লাগছে,আমি মেয়ে আলহামদুলিল্লাহ।

আমাতুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ আমাকে যেদিন আল্লাহ জানান ওইদিন থেকে আমারও অনেক ভালো লাগে। আর জরুরী জানার কিছু আছে আজ?

সাবা: আরেকটু আছে...

আমাতুল্লাহ: আচ্ছা বলো শুনি। কথা বলে খুবই ভালো লাগছে।

সাবা: মুসলমানদের অধিক হারে মৌলবাদী ও একমুখী দেখা যায় কেনো?

আমাতুল্লাহ: মৌলবাদী (Fundamentalist) শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে জানো?

সাবা: না, জানি না।

আমাতুল্লাহ: মৌলবাদী (Fundamentalist) শব্দের উৎপত্তি:

ওয়েবস্টার এর ইংরেজি ডিকশনারী অনুযায়ী fundamentalism ছিল এমন এক আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রোটেস্টেন্টরা আরম্ভ করে। "মৌলবাদ" এমন এক পরিভাষা যা প্রথমে খ্রিস্টানদের একদল সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় যারা বিশ্বাস করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি অক্ষর আল্লাহর বানী এবং এর মধ্যে কোন কম বেশি/ভুল নেই। কিন্তু অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী মৌলবাদ হলো এমন কোন বিশেষ ধর্ম, বিশেষ করে ইসলামের মূল বা ভিত্তির ওপর আমল করা।

পশ্চিমা পন্ডিতগণ এবং তাদের মিডিয়াগুলো মৌলবাদের অভিযোগ থেকে খ্রিস্টানদের অব্যাহতি দিয়ে মুসলমানদের ওপর বিশেষভাবে এ অভিযোগ চাপাচ্ছে৷ আজ মৌলবাদ পরিভাষা যখনই ব্যবহৃত হয় তখনই ব্যবহারকারীর মগজে তৎক্ষণাৎ এমন এক মুসলমানের চিত্র ভেসে ওঠে যে এদের দৃস্টিতে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠাবান এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে তার আকিদাকে প্রচার করে।

ইসলামে মৌলবাদী ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি নিজ বিশ্বাস বা দৃস্টিভংগির দ্বারা মূল কথাগুলোকে সবচেয়ে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে ও তার ওপর আমল করে। যেমন একজন ডাক্তারকে তার মৌলিক কথাগুলোর ওপর জ্ঞানার্জন ও তার ওপর আমলের নিষ্ঠাও থাকতে হবে, ব্যাপারটা তেমন।

সাবা: বাহ তাহলে তো মৌলবাদী হওয়াই উচিৎ সবার সবক্ষেত্রে।

আমাতুল্লাহ: হ্যাঁ, অবশ্যই।বরং মৌলবাদী হওয়া গৌরবের বিষয় এবং সকল মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া জরুরী।

সাবা: আচ্ছা এই যে সব মুসলমান এক কোরআনকে অনুসরণ করে। এরপরও তাদের চিন্তা-ভাবনায় মধ্যে এত পার্থক্য কেন? এত দলাদলী কেনো? এত দলাদলির কারনেই আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা বিভ্রান্ত হচ্ছি।

আমাতুল্লাহ: ইসলাম নিজ অনুসারীদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার ওপর বিশ্বাস করে। তোমার কোরয়ান থেকে বলার চেস্টা করি তাহলে সহজ হবে। (আল্লাহ সহজ করো...মনে মনে বলছে)

"...তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।" (আল ইমরান ৩:১০৩)

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের..." (নিসা ৪:৫৯)

এই দুই আয়াতে স্পস্টভাবে বলা হয়েছে আমাদের করণীয়।

"ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (আল ইমরান ৩:৬৭)

এখানে ইব্রাহিম আ: এর পরিচয় একজন মুসলিম হিসেবে দেয়া হয়েছে। কোন দলাদলি এখানে আসে নি।

"আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?" (সূরা হা মীম সিজদাহ ৪১:৩৩)

সাবা: সুবহানাল্লাহ। প্লিজ continue করো...

আমাতুল্লাহ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৭ হিজরীতে অমুসলিম শাসকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য চিঠি লিখেছিলেন যার শব্দাবলি আল ইমরানে এসেছে:

"তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম"

কোরয়ানে নবীরা বার বার পরিচয় দিচ্ছেন আমরা মুসলমান। আমাদের পরিচয় আমরা মুসলিম।

নবীজী সা: এর এই related হাদিসটা শুনেছো?

সাবা: কোনটা?

আমাতুল্লাহ: এই যে দল নিয়ে? ১৪০০ বছর আগে উনি বলে গিয়েছেন।

সাবা: কি বলও এটিও বলে গিয়েছেন রাসূল সা:?

আমাতুল্লাহ: হ্যাঁ, সব বলে গিয়েছেন। ৭৩ দলে বিভক্ত হবে আমাদের রাসূল সা: এর উম্মতেরা।

নবীজী (সা:) বলেছেন, "...আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেনঃ আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।" (তিরমীযি: ২৬৪১)

সাবা: এই একটি দলেই থাকতে হবে আমাদের...

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ, যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে এর অধ্যয়ন করে এবং বিশুদ্ধ হাদিসের ওপর আমল করে তবে ইন শা আল্লাহ সকল মতানৈক্য শেষ হয়ে যাবে এবং মুসলমানগণ এক ঐক্যমতের উম্মত হয়ে যাবে।

সাবা: তাহলে সবার আগে কাজ কোরয়ান আলমারী থেকে নামাজে হবে, ধুলো ঝেড়ে উস্তায/উস্তাযা থেকে পড়তে হবে এরপর সাথে সাথে হাদিস।

আমাতুল্লাহ : হ্যাঁ এটা জরুরি কারণ একা পড়তে গেলে আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ বেশি।

সাবা: না না বাবা কোনভাবেই না। ৭২ দলে যাওয়াই যাবে না। তুমি কোথায় পড়ছো আমাকে সব খবর দাও আমি পড়বো।

আমাতুল্লাহ: IOM (Islamic Online Madrasah) তে পড়ছি। এখানে কোরয়ান পড়ায় তবুও সহিস উচ্চারণ এর জন্য উস্তাযার কাছে পড়ছি। তবে অফলাইনে পড়তে পারলে বেশি ভালো। যেহেতু আমার বাবু আছে সংসার আছে আপাতত অনলাইনে পড়ছি ভবিষ্যতে অফলাইনে পড়ার নিয়ত আছে।

সাবা: আমার তো আলহামদুলিল্লাহ সংসার বাচ্চা কিছু নেই। কিন্তু হুট করে মাদ্রাসায় যাতায়াত পরিবার কিভাবে নেয়! আমি তোমার ওখানেই শুরু করি এরপর আস্তে আস্তে অফলাইনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকবো ইন শা আল্লাহ।

আমাতুল্লাহ : আল্লাহ তোমাকে কবুল করুক।

তোমার চিন্তাভাবনাগুলো আমার সাথে একই রকম মিলে যায়। তাই তোমার সাথে কথা বলতে অনেক ভালো লাগে। আচ্ছা এখন যাই নিকাব কিনতে?

সাবা: আমিও যাবো তোমার সাথে হিজাব কিনবো।

আমাতুল্লাহ: হিজাব কিনতে হবে না। আমার হিজাবগুলো আমি তোমার নিয়তেই রেখে দিয়েছি আর দোয়া করেছি। আমার হিজাব, আবায়াগুলো দিয়ে শুরু করো আল্লাহর নামে।

সাবা: আল্লাহু আকবার সত্যি?

আমাতুল্লাহ : আমি সব সময় তোমার জন্য দোয়া করতাম কান্না করতাম। হিজাব আবায়া দেখলাম আর আল্লাহকে বলতাম তোমার জন্য রেখেছি তুমি কবুলের মালিক। আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ দোয়া কবুল করেন।

সাবা: আচ্ছা তাহলে চলো আমিও যাবো নিকাব কিনে তোমার বাসায়। ওখান থেকে হিজাব আবায়া পড়ে বাসায় যাবো।

আমাতুল্লাহ: আল্লাহ তোমাকে কবুল করুক। আমাদের সবাইকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মাহ আমিন।

সাবা: আমিন।

৪/ বিষয়: বিজ্ঞান কি আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে?

ইউসুফ: আচ্ছা ভাইয়া,আপনি তো অনেক পড়াশোনা করেন বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে।তাহলে আপনি সৃষ্টায় বিশ্বাসী নন কেন?আপনার ই তো সবার আগে রিলিজিয়াস হয়ে যাবার কথা।

নোয়াহ : আফসোসের কথা শোন–আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করার মতো কোনো ধর্মগ্রন্থের সাথেই এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাই নি!

ইউসুফ: ভাইয়া যদি তাই হয়,আমি বলবো–আপনি এখনো সঠিকভাবে কুরআন পড়েন নি। আপনি যদি শুধুই অর্থ পড়ে যান তাহলে কুরআন বুঝবেন না।কারণ কুরআন এর অর্থ এবং ব্যাখ্যা দু'টি আলাদা জিনিস।

নোয়াহ: ওকে মানলাম,পড়ার পদ্ধতি সঠিক ছিল না।তাহলে তুই-ই এর উপরে প্রমাণ উপস্থাপন কর দেখি...

ইউসুফ: ঠিক আছে।ছোট্ট একটি উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে। প্রথমে কুরআনের দলীল থেকে বলি–
সুরা আর রহমানের ২৬-২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

“ মহাবিশ্বের প্রত্যেক জিনিস ই ধ্বংসশীল।আর অবশিষ্ট থাকবে মহামহিম ও মহানুভব আপনার রব্বের চেহারা (সত্তা)।”
আর আপনি যদি বৈজ্ঞানিক দিক থেকে জানতে চান,এই ব্যাপারেও সৃষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে। এটা হয়তো জেনে থাকবেন- সম্প্রতি, Closed Big Bang বা Closed Universe তত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বলেছেন- "মহাবিশ্ব (Whole universe) একটি বিন্দুতে closed হওয়ার পর এমন এক শক্তিধর সত্ত্বা দৃশ্যমান হয়ে উঠবে-যিনি মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ শক্তি (Gravitation & Gravity) দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে ধারণ করে রেখেছিলেন।"

নোয়াহ:হুমমম...ভালো লজিক দিয়েছিস,আসলেই।

৫/ বিষয়: কুরআন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সংগতিপূর্ণ নাকি অসঙ্গতিপূর্ণ?

ইশা: আচ্ছা বাবা,তুমি তো কুরআনকে বিশ্বাস করো তারপরেও কেন সবকিছু সাইন্সের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেই সেগুলো গ্রহণ করো আর অসংগতিপূর্ণ হলে দ্বিধায় থাকো?

বাবা: সাইন্স ই তো লজিক আম্মু।লজিক দিয়েই তো বিচার করতে হবে।তাই না?

ইশা: বাবা,মহিমান্বিত কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয় বরং এটা হচ্ছে চিহ্ন বা ইংগিতের বই।এটা আয়াত বা নিদর্শনের বই।এতে ৬ হাজারের বেশি আয়াত আছে;যার মধ্যে ১ হাজারের অধিক আয়াত ই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে।এতে এমন কিছু বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা সত্য রুপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।কুরআন পাকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা ধারণা আলোচনা করা হয়নি। কারণ এসব সূত্র বা ধারণার ভিত্তি হচ্ছে প্রমাণহীন অনুমিতি।কারণ বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান তার নিজের দিকে ফিরে বিপরীত ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

বাবা: হুমম।সত্যিই বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল।সঠিক যুক্তিই দিয়েছো মনে হচ্ছে।

৬/ বিষয়: কিয়ামত কি আসবে? বিজ্ঞান কী বলে

ইয়াহইয়া: সারাক্ষণ এমন অবাস্তব নাটক,সিনেমা দেখলে মন-মানসিকতা বিকৃত হয়ে যায়,চোখের যিনা হয়।কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে তো জানোই যে,কিয়ামতের আগে অশ্লীলতা বেড়ে যাবে?তুমিও কি এর সমর্থক হতে চাও?

শায়েরী: কিয়ামত কি আসবে আদৌ?

ইয়াহইয়া: এটা আল্লাহর ওয়াদা সুতরাং অবশ্যই আসবে এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে অর্থ পড়লে বুঝতে।কুরআন থেকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি তোমাকে। আল্লাহ পাক সুরা আম্বিয়ার :১০৪ নং আয়াতে বলেছেন–
"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দপ্তর; যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য; আমি এটা পালন করবই।**"**
সুরা ফাজরে ২১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন–
"সেদিন পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গুড়া হয়ে যাবে।**"**
সুরা ইনফিতারে ১-২ নং আয়াতে–
"সেদিন আকাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং গ্রহসমূহ ছড়িয়ে পড়বে।**"**
এছাড়া সুরা ইনশিক্বক ১ নং আয়াতে তিনি বলছেন–**"** সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পৃথক হয়ে যাবে।**"**

শায়েরী: কিছু সাইন্সিটিফ উদাহরণ ও দাও শুনি।

ইয়াহইয়া: হ্যাঁ এমনকি এটা বৈজ্ঞানিকভাবেও প্রমাণ করা যায়।বিজ্ঞানীরা বলেন–মহাকাশের সমাপ্তি ঘটবে এমন এক সময়ে, যখন এর গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং মহাকর্ষীয় শক্তির প্রাবল্য বেগবান হবে।সাথে সাথে সম্প্রসারণ গতি থেমে যাবে।ফলে গ্রহ,উপগ্রহ,নক্ষত্র,গ্যালাক্সি,কোয়াসার প্রভৃতি জ্যোতিস্ক –মহাকর্ষীয় টানে পরস্পরের নিকট এসে সংঘর্ষ শুরু করবে।বিশাল মহাজগৎ একটি বিন্দুতে এসে Closed হবে।

শায়েরী: হুমম...,চিন্তা-ভাবনা করে পড়লে আসলেই অনেক কিছু বোঝা যায় তাহলে!

৭/ বিষয়:সবকিছুর ই একজন সৃষ্টা আছেন,তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

ইবরাহীম: আম্মু একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে।সবকিছুই তো আল্লাহ বানিয়েছেন, তাই না?

আম্মু: হ্যাঁ বাবা।আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।এই দুনিয়ায় এবং দুনিয়ার বাইরে যা কিছু আমরা দেখি অথবা দেখতে পাই না তা আল্লাহই বানিয়েছেন।তিনি খলিক্ব অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা।আর আমরা মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু।

ইব্রাহীম: আচ্ছা।যদি সবকিছুর ই একজন সৃষ্টিকর্তা থাকেন তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন, আম্মু?
আম্মু: আসলে বাবা বাক্যটা এমন হবে না।বরং এভাবে হবে– প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর ই একজন

সৃষ্টিকর্তা আছেন।আল্লাহর সঙ্গা হচ্ছে অসৃষ্ট।আল্লাহই যেহেতু সত্যিকারের সৃষ্টিকর্তা।সবকিছুই যিনি বানিয়েছেন তাঁর কোনো সৃষ্টা নেই।তাকে কেউ বানান নি। আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি বাবা?

ইবরাহীম: হ্যাঁ আম্মু। আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পেরেছি।জাযাকিল্লাহু খইরন।
আম্মু: ওয়া ইয়্যাক।

৮/ বিষয়: মুসলিমরা খোদাকে আল্লাহ কেন বলে

(বিদেশি ইউনিভার্সিটির ছাত্র ঈসা এবং তার কানাডিয়ান বন্ধু হেনরি-এর সঙ্গে দাওয়াতি কথোপকথন)

ঈসা–বুঝলে, ইসলাম এত বেশি সুন্দর,প্রতিটা বিষয়ই দাওয়াত হতে পারে।
হেনরি–হুম।অনেক গল্পই তো বললে তোমাদের নবি-রাসুলদের নিয়ে,ইন্টারেস্টিং মনে হলো।তোমাদের গড তাহলে ইসলামকে অনেক বেশি সহজ করেছেন।

ঈসা– ও হেনরি ,সৃষ্টাকে ইসলামে গড বলে না,আল্লাহ বলে।এবং গড বলাটা ঠিক ও না। কারণ 'গড এবং আল্লাহ 'এই দুটো শব্দের মধ্যে বেশ অনেকটা পার্থক্য আছে।
হেনরি– আচ্ছা,ইন্টারেস্টিং! তবে আমি কিন্তু আমার অন্য মুসলিম ফ্রেন্ডদেরকেও আল্লাহকে গড বলতে শুনেছি ঈসা।

ঈসা–হুম তা সত্যি কারণ অনেক মুসলিমরাও হয়ত তা জানে না।পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে মুসলিমরাও অতি সাধারণ ক্ষেত্রেও 'আল্লাহ' না বলে 'গড' বলাকেই বেশি স্মার্টনেস মনে করছে।কিন্তু ইসলামের সর্ব ক্ষেত্রেই সতন্ত্রতা রয়েছে।
কুরআনে সুরা ইখলাসে বলা হয়েছে 'বলুন,তিনিই আল্লাহ,এক এবং একক।আল্লাহ অদ্বিতীয়, অনন্ত।তিনি কাউকে জন্ম দেননি।কারো দ্বারা জন্মগ্রহণ ও করেন নি।এ পৃথিবীতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'
God ইংরেজি শব্দ,খাঁটি আরবি শব্দ আল্লাহ।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই। God এর সাথে S যুক্ত করলে Gods অর্থাৎ বহুবচন হবে,কিন্তু আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই।God এর সাথে ess যুক্ত করলে Goddess অর্থাৎ নারী হবে। আল্লাহর নারী-পুরুষ বলতে কিছু নেই।আল্লাহর লিঙ্গভেদ নেই।ইসলামে একজনই সত্য আল্লাহ,কোনো মিথ্যা আল্লাহ নেই।বড় হাতের God লেখলে হবে সত্যিকার,ছোট হাতের god লেখলে হবে নকল খোদা।God এর সাথে father যুক্ত করলে হবে godfather.আল্লাহর সাথে আব্বা কিংবা ফাদার যুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই।god এর সাথে mother যুক্ত করলে হবে godmother.আল্লাহর সাথে 'মাদার'বা 'আম্মি আল্লাহ'বলতে কিছু নেই।God এর পূর্বে টিন

যুক্ত করলে হয় 'টিনগড' অর্থাৎ বাতিল গড।ইসলামে টিন আল্লাহ বলতে কিছু নেই।আল্লাহ খাঁটি এবং একক।

হেনরি– ওয়াও, এত সুক্ষ্ম বিষয়ও থাকতে পারে দলিল-প্রমাণসহ!সত্যি চমৎকার একটি বিষয়।এ সম্পর্কে তোমার ভালোই গবেষণা আছে দেখছি!

৯/ বিষয়: বিজ্ঞানের অপরিপূর্ণ ব্যাখ্যায় – মুসলিমদের আকিদায় কু প্রভাব

(টিচার্স ট্রেইনিং শেষে রাইয়ান আর আম্মার –দুই কলিগ এর মধ্যে কথোপকথন)

রাবিত– ভাই,এই যে বিজ্ঞান সবসময় বুঝিয়ে আসছে প্রকৃতিই সবকিছু করে,কথাটা কি আপনার কাছে পরিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়?

আম্মার– কেন?ভুল মনে হওয়ার কী কারণ হতে পারে? বৈজ্ঞানিক সবকিছুই তো ভেঙেচুরে প্রমাণ করাই থাকে।

রাবিত– না না, আমি মূলত বিজ্ঞানকে ভুল বলছি না,গ্রহণযোগ্যতার কথা বলছি।অর্থাৎ, আমাদের ছাত্রজীবনে ছোট থেকে যেভাবে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান শিক্ষার্থীদের ও একই ভাবে দেওয়া হচ্ছে তবে তা আসলে পরিপূর্ণ নয়।

আম্মার– বিষয়টা কেমন?

রাইয়ান–সবকিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তার পেছনে একজন মূল দক্ষ ব্যবস্থাপক এবং তার সুপরিকল্পনা আবশ্যক।এটা তো সবাই বিশ্বাস করে, রাইট?

আম্মার– হুম, শতভাগ সত্য।

রাইয়ান– যে প্রক্রিয়ায় পানি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তাকেই পানিচক্র বলে। ভাই,একবারো কি এই প্রশ্নটা আসে, চক্র তো তার মতো চলছে কিন্তু এই চক্রটা কার অনুমতিতে হচ্ছে? এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, অথচ এর কোনো ব্যবস্থাপক নেই।সোজাভাবে বলতে গেলে,বিশ্বের সবকিছুই একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে হচ্ছে কিন্তু এই সিস্টেমকে কেউ ম্যানেজ করছে না এটা কী আদৌ সম্ভব?

আম্মার– কিন্তু এভাবে তো কেউ চিন্তা করবে না।

রাইয়ান–আমরা এত এত সিস্টেম শেখাচ্ছি,শিক্ষার্থীদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে,সৃজনশীলতার মতো বিষয় নিয়ে কাজ করছি অথচ এতটুকু ভাবনার বীজ তাদের মধ্যে বপন করতে পারব না,এটা আজব বিষয় নয় কি? এরচেয়েও সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যিনি ব্যবস্থাপনা করছেন আল্লাহ রব্বুল আল-আমীনকে সকল ব্যবস্থাপনার আগে শুরুতেই চিনিয়ে দেওয়া।আজ প্রতিপালকের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে না বলেই শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের সব সিস্টেম বোঝে কিন্তু সিস্টেম ম্যানেজমেন্টে তার সৃষ্টিকর্তা আছেন,এটা বোঝে না।এতে সে মনে করে সবকিছুই প্রকৃতি করছে।কিন্তু সুবহানাল্লাহ প্রকৃতির কী এমন ক্ষমতা আছে,আজ চিন্তাশীল পৃথিবীর মানুষদের থেকে এমন অজ্ঞের মতো ভাবনা নিয়ে থাকবে বিষয়টা তো সেইসব মানুষদের জন্য চরম অপমানজনক নয় কি?কোনো ধবংসশীল প্রাণী বা বস্তু কি আপনা-আপনি কোনো সৃষ্টা ছাড়াই তৈরি হতে পারে?

আম্মার– খুবই সুন্দর একটা দিক তুলে ধরেছেন ধরেছেন।আমাদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে– এ বিষয়ে আওয়াজ তোলা।আজ সাইন্সের মুসলিম স্টুডেন্টরা তো এমনি এমনি নাস্তিক,সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছে না। প্রকৃতিকেই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা মনে করছে।অথচ কেউ যদি সঠিক পদ্ধতি বিজ্ঞান জানাশোনা করে সে কখনোই নাস্তিক হতে পারে না বরং ঈমান মজবুতিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে একই সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানে বিশ্বাসী কাফিরদের দাওয়াত দেওয়াটাও সহজ হয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।

১০/ বিষয়: মানুষের জন্য আমিষ খাবার কি অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ

আব্দুল্লাহঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা তুহ্
শেখ তাপশঃ ওয়ালাইকুম সালাম
আব্দুল্লাহঃ কেমন আছেন ভাই
শেখ তাপশঃ আছি ভালোই
আবদুল্লাহ :তাপশ ভাই আপনি তো একজন মুসলিম।মুসলিম হয়েও আপনি কি জানেন, ইসলামে মুসলিমদের খাবারে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে?
শেখ তাপশ : না ভাই,পুরোপুরি জানি না। ইসলামের মানুষের খাবারের মধ্যে আমিষ খাবারের কোনো বাধ্যবাধকতা কি আছে?
আবদুল্লাহ:
সুস্থ-সবল শরীরে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো উত্তম ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য এবং শারীরিক পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। আবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খেলে তা স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
অর্থাৎ,অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ ও অপচয় করা থেকে নিরুৎসাহ করা হয়েছে।

তবে,ইসলামি শরীয়তে আমিষ খাবারের মধ্যে হালাল - হারাম নির্ধারণ করে দিয়েছে।

→ আমিষ হলো, যে খাদ্যে কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন একত্রে থাকে সেগুলোই আমিষ খাদ্য। আমিষ মূলত দুই প্রকার। ১) প্রাণীজ, ২) উদ্ভিজ্জ।
প্রাণীজ আমিষ হলো, যেগুলো প্রানী থেকে পাওয়া যায়। যেমনঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। আর উদ্ভিজ্জ আমিষ হলো যেগুলো উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। যেমনঃ ডাল, বাদাম, সয়াবিন, গম ইত্যাদি।
→ নিরামিষ হলো, যে খাদ্যে আমিষের পরিমান কিঞ্চিৎ পরিমানও নেই। যেমনঃ ধান, পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি।
প্রানীজ আমিষের মধ্যে রয়েছে দুই ধরনের প্রাণী -স্থলজ প্রাণী ও জলজ প্রাণী।
তাপশ: ভাই খাদ্য গ্রহণে ও ইসলামের কোনো রীতি নীতি আছে কি?
আবদুল্লাহ :
জ্বি আছে ভাই।পবিত্র, স্বাস্থ্যসম্মত ও উপকারী সবধরনের খাবার গ্রহণে ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে। যেসব খাবার অপবিত্র ও অবৈধ তা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আপনি বলে দিন, যা কিছু বিধান ওহির মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, আহারকারী যা আহার করে তাতে তার জন্য আমি কোনো হারাম খাবার পাই না; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস–এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ। (সুরা আন-আম, আয়াত:১৪৫)
সাধারণত যেসব খাবার আমরা গ্রহণ করে থাকি, তা দুই প্রকার।
একটি পশু-পাখি, অপরটি উদ্ভিদ ও শাকসবজি।
পশু-পাখি : পশু-পাখির ক্ষেত্রে কিছু নিদর্শন ও বিধি-বিধান লক্ষ্য করলে হালাল-হারাম নির্ণয় করা সহজ। যে প্রাণীতে হারামের কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে, তা খাওয়া জায়েজ নেই। দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জন্তু হারাম। যেমন- বাঘ-সিংহ, নেকড়ে বাঘ, চিতা বাঘ, হাতি, কুকুর, শিয়াল, শূকর, বিড়াল, কুমির, কচ্ছপ, সজারু ও বানর ইত্যাদি।
পাঞ্জাধারী হিংস্র পাখি খাওয়া হারাম। যেমন, ঈগল, বাজ, শ্যেন, পেঁচা ইত্যাদি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসুল (সা.) দাঁতবিশিষ্ট প্রত্যেক হিংস্র জন্তু ও নখ দিয়ে শিকারকারী প্রত্যেক হিংস্র পাখি খেতে নিষেধ করেছেন। ' (মুসলিম, হাদিস নং : ১৯৩৪)
নির্দিষ্টভাবে যেসব পশু খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা খাওয়া হারাম। যেমন, গৃহপালিত গাধা। জাবের (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) খায়বরের দিন গৃহপালিত গাধা খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। ' (বুখারি, হাদিস নং: ৪২১৯, মুসলিম, হাদিস নং: ১৯৪১)
আরেকটি উদাহরণ, শূকর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত। ' (সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩)
নোংরা ও নাপাক কিছু খাওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তাদের জন্য তিনি (রাসুল) পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। ' (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭)

যেমন- মৃত জন্তু, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, প্রবাহিত রক্ত এবং সেসব খাবারে কোনো প্রকার উপকার নেই যেমন বিষ, মদ, খড়কুটা, মাদকদ্রব্য, তামাক ও অন্যান্য নেশজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি।

যেসব প্রাণী হত্যা করতে শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে বা যেসব প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছে, তা খাওয়া হারাম। যেমন- ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি, বিচ্ছু, কাক, চিল ইত্যাদি। কারণ হাদিসে এগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইসলামকর্তৃক নিষিদ্ধ প্রাণীও হারাম। যেমন- হুদহুদ, দোয়েল, ব্যাঙ, পিঁপড়া ও মৌমাছি ইত্যাদি।

আল্লাহ নাম নেওয়া ছাড়া জবাইকৃত হালাল পশু-পাখিও হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা তা থেকে আহার করো না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন। ' (সুরা আন-আম, আয়াত : ১২১)

হালাল প্রাণী জবাই শুদ্ধ না হলে, জবাইকৃত সে প্রাণীও হারাম। আবার জীবিত প্রাণী থেকে আলাদা করা গোশতও মৃত প্রাণীর মতো হারাম। জবাই করার কিছু ইসলামী নিয়ম -নীতি ও শর্ত রয়েছে। সেগুলো পূর্ণ না হলে, জবাইকৃত হালাল জন্তুও হারাম হয়ে যায়।

নাপাক বস্তু থেকে সৃষ্ট পোকা-মাকড় এবং যার শরীরে প্রবাহিত রক্ত নেই, সেগুলোও নাপাক। যেমন তেলাপোকা ইত্যাদি।

সব ধরনের মৃত প্রাণী এবং প্রবাহিত রক্ত হারাম। তবে দুই ধরনের মৃত প্রাণী ও রক্ত হালাল। রাসুল (সা.) বলেন, 'আমাদের জন্য দু'প্রকার মৃত প্রাণী ও দু'প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী হলো, মাছ ও পঙ্গপাল। আর রক্ত হলো, কলিজা ও প্লীহা। ' (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং : ৫৭২৩, ইবনু মাজাহ, হাদিস নং: ৩২১৮)

যেসব পশু বা পাখির অধিকাংশ খাদ্যই নাপাক, সেগুলোর ওপর আরোহণ করা, সেগুলোর গোস্ত-ডিম খাওয়া এবং দুধ পান করা হারাম।

উদ্ভিদজাতীয় খাবার: খাদ্য ও পানীয়ের মূল প্রকৃতি হচ্ছে বৈধ ও হালাল হওয়া। সে সূত্রে বিভিন্ন উদ্ভিদ, ফল, শস্য ইত্যাদি থেকে তৈরিকৃত পানীয় হালাল। তবে যত ধরনের খাবার ও পানীয় নেশা তৈরি করে, তা খাওয়া বা পান করা জায়েজ নেই। যেমন, গাঁজা, আফিম, ইয়াবা, বিয়ার, শ্যাম্পেইন, হেরোইনসহ এ জাতীয় অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য।

যা কিছু শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর, তাও জায়েজ নেই। যেমন, বিষ, সিগারেট ও এলকোহল জাতীয় অন্যান্য খাবার ও পানীয়। যেগুলোর ক্ষতি ও অপকারিতা সবার কাছে স্পষ্ট।অতএব, সুস্থতা হল ইলম-আমলের পূর্ণ হক আদায় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।সুস্থতা এবং শরীরের ভারসাম্য মানুষকে যেমন কাজকর্মে স্পৃহা জোগায় তেমনি কাজটি যথাযথ আঞ্জাম দেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে। তাই সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রে 'সর্বোত্তম পন্থা মধ্যম পন্থা' এর নীতি অবলম্বন করতে হবে। ইসলামী তাহযীব জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো এ বিষয়টিকেও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছি।

১) হালাল খাদ্য গ্রহণ ও বৈধ পন্থায় উপার্জন হালাল খাদ্য খেতে হবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-'হে রাসূলগণ! পবিত্র হালাল বস্তু আহার করুন এং সৎ কাজ করুন।-সূরা মুমিনূন : ৫১

'হে মানব সম্প্রদায় পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর।'-সূরা বাকারা:১৬৮

২) উপার্জিত খাদ্য বৈধ পন্থায় হতে হবে।
কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।'-সূরা নিসা : ২৯
আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা তা থেকে আহার করো না যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন। ' (সুরা আন-আম, আয়াত : ১২১)
৩)স্বাভাবিক এবং সাধারণ খাবার খাওয়া।
সাধারণ খাদ্য খাওয়া এবং সহজলভ্য খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত থাকা, বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী করা এটা ইসলামের আদর্শ।
৪)উদরপূর্তি নয়; কখনো পরিতৃপ্তি, কখনো অল্পে তুষ্টি।
খাদ্য নিয়ে মেতে থাকা এবং ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে এবং যে পরিমাণ আল্লাহ রিযিকে রেখেছেন ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থকা এবং নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।
তাপশ:- তাহলে খাবার গ্রহণে রাসুল (সা.) এর সুন্নত নিশ্চয় আছে ?
আবদুল্লাহ :
জ্বি অবশ্যই আছে।রাসুল (সা.) তার প্রিয় সাহাবিদের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ–প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। তার প্রতিটি কর্ম ও পদক্ষেপ মানবতার অনুসরণযোগ্য।

১)খাবার গ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওআখিরাহ বলা। রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর নাম নিয়ে ও ডান হাত দ্বারা খানা খাও। এবং তোমার দিক হতে খাও। ' (বুখারি, হাদিস নং : ৫১৬৭, তিরমিজি, হাদিস নং : ১৯১৩)

২)খাওয়ার আগে-পরে হাত ধোয়া

খাওয়ার আগে হাত ধোয়া মুস্তাহাব। খাওয়ার পরে হাত ধোয়া সুন্নত। (তুহফাতুল আহওয়াজি: ৫ / ৪৮৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ২৭৪৮৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪৯৩)

৩)দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া

আনাস (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) পায়াবিশিষ্ট বড় পাত্রে খাবার খেতেন না। কাতাদা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে কীসের ওপর খানা খেতেন? তিনি বললেন, 'চামড়ার দস্তরখানের ওপর। ' (বোখারি : ৫৩৮৬)

৪)ডান হাত দিয়ে খাওয়া

রাসুল (সা.) আজীবন ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন। বাম হাত দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন তিনি। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা বাম হাত দ্বারা খাবার খেয়ো না ও পান করো না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে। ' (বুখারি, হাদিস নং: ৫৩৭৬; মুসলিম, হাদিস নং: ২০২২)

৪)প্লেটের একপাশ থেকে খাওয়া

খাবার প্লেটের এক পাশ থেকে খাওয়া সুন্নত। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘খাবারের মধ্যখানে বরকত নাজিল হয়। তোমরা একপাশ থেকে খাও। মধ্যখান থেকে নয়।’ (তিরমিজি, হাদিস: ১৮০৫; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩২৭৭)

৫)হাত চেটে খাওয়া

রাসুল (সা.) খাওয়ার সময় সর্বদা হাত চেটে খেতেন। না চাটা পর্যন্ত কখনো হাত মুছতেন না। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমরা যখন খাবার গ্রহণ করবে, তখন হাত চাটা নাগাদ তোমরা হাতকে মুছবে (ধোয়া) না। ’ (বুখারি, হাদিস নং : ৫২৪৫)

৬)আঙুল চেটে খাওয়া

আঙুল চেটে খাওয়ার ফলে বরকত লাভের অধিক সম্ভাবনা থাকে। কারণ খাবারের বরকত কোথায় রয়েছে মানুষ তা জানে না। রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমরা যখন খাবার গ্রহণ করো তখন আঙুল চেটে খাও। কেননা বরকত কোথায় রয়েছে তা তোমরা জানো না। ’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ১৯১৪)

৭)পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়া

খাওয়ার সময় কিছু পড়ে গেলে তা উঠিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে খাওয়া সুন্নত। মহানবী (সা.) এমনটি করার নির্দেশনা দিয়েছেন। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ১৪২১৮; মুসলিম, হাদিস: ২০৩৪)

৮)হেলান দিয়ে না খাওয়া

কোনো কিছুর ওপর হেলান দিয়ে খাবার খেতে তিনি নিষেধ করেছেন। হেলান দিয়ে খাবার খেলে পেট বড় হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা প্রকাশ পায়। আবু হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-এর দরবারে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন, আমি টেক লাগানো অবস্থায় কোনো কিছু ভক্ষণ করি না। (বুখারি, হাদিস নং: ৫১৯০, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯৮৬)

৯)খাবারের দোষ না ধরা

রাসুল (সা.) কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, ‘রাসুল (সা.) কখনো খাবারের দোষত্রুটি ধরতেন না। তাঁর পছন্দ হলে খেতেন আর অপছন্দ হলে ত্যাগ করতেন।’ (বুখারি, হাদিস: ৫১৯৮, ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৩৮২)

১০)যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা

ঘরে সব সময় ভালো খাবার থাকে না। তাই যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত। (মুসলিম, হাদিস: ২০৫২)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা আমার নিয়ামতগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য আমার নিয়ামত বাড়িয়ে দেব।’ (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-৭)।

১১) খাবারে ফুঁ না দেওয়া

খাবার ও পানীয়তে ফুঁ দেওয়ার কারণে অনেক ধরনের রোগ হতে পারে। রাসুল (সা.) খাবারে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) কখনো খাবারে ফুঁ দিতেন না। কোনো কিছু পান করার সময়ও তিনি ফুঁ দিতেন না। (ইবনে মাজাহ, হাদিস নং : ৩৪১৩)

১২) খাবারের শেষে দোয়া পড়া

আল্লাহ তাআলা খাবারের মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ করেন। এ দয়ার কৃতজ্ঞতা আদায় করা সভ্যতা ও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। খাবার গ্রহণ শেষে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য।

খাবার শেষে রাসুল (সা.) আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতেন ও দোয়া পড়তেন। আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) খাবার শেষ করে বলতেন, ‘আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসিরান ত্বয়্যিবান মুবারাকান ফিহি, গায়রা মাকফিইন, ওলা মুয়াদ্দায়িন ওলা মুসতাগনা আনহু রাব্বানা। ’ তিনি কখনো এই দোয়া পড়তেন: ‘আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আতআমানা ওয়াছাকানা ওয়াজাআলানা মিনাল মুসলিমিন। ’ (বুখারি, হাদিস নং : ৫৪৫৮) রাসুল (সা.)-এর সুন্নতগুলো জীবনে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে, জীবন সুন্দর ও সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

১১/ বিষয়:মিডিয়া ও ইসলাম

আবদুল্লাহঃ তাপশ ভাই মিডিয়া সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?
তাপশঃ
কোন কিছু প্রচারে যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় সেটাই মিডিয়া। মিডিয়ার প্রধানত দু'টি স্তর রয়েছে-
(১) প্রিন্ট মিডিয়া অর্থাৎ পত্র-পত্রিকা বা সংবাদপত্র।
(২) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অর্থাৎ স্যাটেলাইট, মোবাইল, কম্পিউটার, টিভি, রেডিও ইত্যাদি। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলার ক্ষেত্রে মিডিয়ার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। মিডিয়ার ধারক-বাহক ও চালক যে কাজে তাকে চালাবে সে কাজেই তো মিডিয়া চলবে ও ব্যবহৃত হবে।
আবদুল্লাহঃ আর এই মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য সন্ত্রাস ছড়ায়।
যেমন:-
১)মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম বিদ্বেষ।
২)ইসলামের উপর মিথ্যা আরোপ।
৩)মিডিয়ার প্রতারণা ইত্যাদি।

তাপশঃ আবদুল্লাহ ভাই এই সম্পর্কে একটু ডিটেইলসে বলবেন প্লিজ।
কিভাবে তারা মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার করে ?

আবদুল্লাহঃ জ্বি অবশ্যই।আপনি নিশ্চয় শুনেছেন-
সম্প্রতি পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ইসলাম আতংক ছড়িয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। আর ইসলাম আতংক ছড়িয়ে দিতে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলোই মূল ভূমিকা পালন করছে। পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমের বৈচিত্র ও আধিক্য, প্রচারণাকে আরও গতিময় করেছে।পাশ্চাত্যে বিশেষ করে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলাম আতংক সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ইসলাম বিরোধী অনেকগুলো চলচ্চিত্র নির্মাণ করে তা বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হয়েছে। এর সর্বসাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে ফিৎনা চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ইসলাম ও পবিত্র কোরআনকে অবমাননা করা হয়েছে। এছাড়া, পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো প্রতিনিয়ত কৌশলে মুসলমানদেরকে সহিংসতাকামী, পশ্চাৎপদ ও বখাটে হিসেবে তুলে ধরছে। ফিলিস্তিন,আফগানিস্তান ও ইরাকের ঘটনাবলী সম্পর্কিত খবরাখবর ও প্রতিবেদনগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই, পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো কিভাবে সত্যকে বিকৃত করছে। তারা ঘুরিয়ে-পেচিয়ে সবকিছুর জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের দায়ী হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। শুধু রেডিও, টেলিভিশনই নয় পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রগুলোও একই কাজ করছে। ইসলাম আতংক সৃষ্টির জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ ও কার্টুন প্রকাশ করছে। উদাহরণ হিসেবে ডেনমার্কের পত্রিকায় বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:)-র ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসুল

ও ইসলাম অবমাননাকর ঐসব কার্টুন পরে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের পত্রিকায় পুন:প্রকাশ করা হয়।
বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের গণ মাধ্যমগুলোর সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলো নিজেরা সমন্বয় ও যোগাযোগের ভিত্তিতে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপের পত্রপত্রিকায় রাসুল (সা:)-র ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রকাশের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডেনমার্কের একটি দৈনিকে কার্টুনগুলো প্রকাশের পরই পাশ্চাত্যের অন্যান্য পত্রিকাতেও একযোগে ঐসব কার্টুন প্রকাশিত হয়। ইসলাম বিরোধী কোন বিষয় হলেই তারা বিভিন্ন অজুহাতে তা সব গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করে।

প্রচার মাধ্যমে ইহুদীদের আধিপত্য অতি প্রবল। রয়টারের মত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা তাদেরই। টাইম, নিউজ উইকের মত বহুল প্রচলিত পত্রিকাগুলোর প্রভাবশালী সাংবাদিক ও কলামিস্ট তারাই। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইহুদী শিক্ষকগণই অধিকতর প্রভাবশালী। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে প্রচার মাধ্যম এসব শিক্ষকদের মতামতকেই অধিকতর গুরুত্ব দেয়। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশাসনও নির্দেশনা নেয় তাদের থেকেই। প্রচারে ইহুদীদের প্রভাবের কারণেই ফিলিস্তীনী বসতি নির্মূলের পরও আগ্রাসী ইহুদীরা প্রচার পায় শান্তিবাদী রূপে। অথচ ইসরাঈলের জন্মই হয়েছে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে। টিকেও আছে বিরামহীন সন্ত্রাস চালিয়ে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যুদ্ধ আর সন্ত্রাস চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তিকে তারাই বিনষ্ট করেছে। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, মার্কিনীদের পর তারাই এখন বিশ্বের বৃহৎ আগ্রাসী শক্তি। আর এদের সাফাই গাচ্ছে পাশ্চাত্যের মি ডিয়া। মিডিয়ার হাতে জিম্মী পশ্চিমা বিশ্বের রাজনীতিকেরাও, ঈসরাঈলী স্বার্থের বিরোধিতা দূরে থাক তাদের স্বার্থে সামান্য নীরবতাও তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনে। মিডিয়ার আগ্রাসনের মাধ্যমে ফিলিস্তীনীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞকে তারা একটি ন্যায্য যুদ্ধ রূপে বিশ্বময় প্রচার করছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে সেটি গ্রহণযোগ্যতাও পাচ্ছে। মিডিয়া যে কিভাবে মানুষের মনের ভুবনে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এ হ'ল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এককালে বহু অর্থ ও বিপুল রক্তক্ষয়ে প্রকান্ড এক সামরিক যুদ্ধ লড়েও এমনটি সম্ভব ছিল না। আগ্রাসী শক্তি রূপে এটিই হ'ল মিডিয়ার ক্ষমতা। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আজ সে শক্তির কাছেই প্রচন্ডভাবে পরাজিত।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপকহারে অপপ্রচারে অনেক মিডিয়া লিপ্ত আছে। তন্মধ্যে ২০০টি রেডিও ষ্টেশন, ১৭০০টি টিভি চ্যানেল এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য প্রায় ২২ হাযার ম্যাগাজিন প্রতিনিয়ত ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের যুগ। তাই বিশ্বের যেকোন প্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়। আর এ খবর যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে তা

হ'ল এই আধুনিক নিউজ মিডিয়া। ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি সহ বিশ্বের প্রধান নিউজ মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণ ইসলাম বিদ্বেষীদের করায়ত্তে। এ কারণে প্রতিদিন ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রচার, কুৎসা রটনা ও বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে সহজ-সরল মানুষদেরকে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে।কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য মুসলিম বিশ্বের গণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে সে ধরনের কোন যোগাযোগ ও সমন্বয় নেই বললেই চলে।

মুসলিম বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোর আরেকটি সমস্যা হলো, তারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশনকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করে না এবং তাদের ইসলাম ধর্মের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করার সৎ সাহসের অভাব রয়েছে। গণমাধ্যমগুলোর দর্শক, শ্রোতা ও পাঠকরা মুসলমান হবার পরও এসব গণমাধ্যম থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি খুব একটা প্রচার হয় না। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অভাব থেকেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে সন্দেহপ্রবণ মানুষকে ইসলামপন্থীদের পক্ষে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই জ্ঞান অর্জনসহ বিভিন্ন পন্থায় নিউজ মিডিয়ার যুগে একটি বস্তুনিষ্ঠ ও প্রতিবাদী নিউজ মিডিয়া সৃষ্টি করলে একবিংশ শতাব্দী ইসলামের বিজয়ের শতাব্দীতে পরিণত হবে ইনশা-আল্লাহ।

ইসলামের উপর কেনো মিথ্যা আরোপ করা হয়

ইসলাম মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। মানবতার শান্তি ও কল্যাণ সাধনের জন্যে আল্লাতালালা এমন কিছু বিষয়কে ইসলামে নিষিদ্ধ করেছেন, যেগুলো পালনের মধ্যে রয়েছে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, হতাশা, পরিবেশের বিপর্যয় ও সামাজিক অবক্ষয়ের উপাদান, অপবাদ ও অপপ্রচার তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর আবহমানকাল ধরে এগুলো ইসলামের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছে। যুগে যুগে নবী ও রাসূলদের উপর অপবাদ ও অপপ্রচার করে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা মনে করছে যে, অপবাদ ও অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের অগ্রযাত্রার গতিকে রোধ করবে অথবা পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল প্রখ্যাত, বরণ্য ও বিশিষ্ট আলেম-উলামাদের উপর অপবাদ ও অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা মনে করছে যে, বিশিষ্ট আলেম-উলামাদের উপর অপবাদ ও অপপ্রচার চালালে বাংলাদেশে ইসলামের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়া যাবে, এদের সাথে সূর মেলাচ্ছে তথাকথিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। তারা তিলকে তাল বানিয়ে বিভিন্ন কল্পকাহিনী তৈরি করে তাদের মিডিয়ায় প্রচার করছে। কিন্তু তাদের এ কর্মকান্ড দেশের ১৭ কোটি তৌহিদী জনতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছে

ইসলাম এই সমস্ত অপবাদ ও অপপ্রচারকারীদের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে। ''অপবাদ'' গীবতের চেয়েও মারাত্মক। কোন লোকের মধ্যে

যে দোষ নেই তারপ্রতি সে দোষ আরোপ করাকে অপবাদ বলা হয়। আরবীতে একে ‘‘বুহতান’’ বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি কোন গুণাহ বা নাফরমানি করলো এবং তারপর এক নিরপরাধ ব্যক্তির উপর তার অপবাদ আরোপ করলো সে এক মহাক্ষতি ও স্পষ্ট গুণাহকেই নিজের মাথায় চাপিয়ে নিল।’’ (সূরা নিসা ১১২)।
আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, ‘‘যারা মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে কষ্ট দেয়, তারা আপন মাথায় ‘‘বুহতান’’ ও স্পষ্ট গুণাহ চাপিয়ে নিল। ’’ (সূরা আহযাব ৫৮)

অপবাদ ও অপপ্রচারকারীদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন ধ্বংস এবং তারা অভিশপ্ত।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘‘যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।’’ (সুরা নূর ২৩)।
নবী করিম (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন : ‘‘মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ ও গুণাহ খুঁজতে থাকে, আল্লাহ তার গোপন দোষ ফাঁস করতে লেগে যান। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করতে লেগে যান, তাকে তিনি অপমান করেই ছাড়েন-সে তার ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকুন না কেন।’’ (তিরমিযী)।

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অপবাদ ও অপপ্রচার চালানোকে ইসলাম নিষেধ করেছে এবং এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেছে।

মিডিয়ার প্রতারণা
সত্য তথ্য সঠিক জ্ঞানের উৎস। মিডিয়া বা মাধ্যম হলো তথ্যের বাহন।তথ্যপ্রাপ্তির জন্য মিডিয়া অতীব জরুরি উপকরণ।
পশ্চিমা বিশ্ব বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত প্রচার মাধ্যমের উপর একচেটিয়া প্রধান্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে গোটা মিডিয়া জগত। তথ্য বিকৃতি ও ভুল তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে বিশেষত মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করছে। নানা কায়দায় ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম,কৃষ্টি,সভ্যতা, ও আকীদা বিশ্বাসকে সমূলে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র লিপ্ত রয়েছে।

মুসলিম জনগোষ্ঠির ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্টার আন্দোলন ও জাগরণকে ,সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত আখ্যা দিয়ে এরা বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল চালাচ্ছে। দুনিয়ার সব কয়টি আন্তজার্তিক সংবাদ সংস্থা ও টিভি নেটওয়ার্ক ইয়াহুদী এবং পশ্চিমা জগতের নিয়ন্ত্রণে থাকায় তাদের দেয়া তথ্য ও সংবাদ এবং প্রচারণার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে

গোটা দুনিয়ার মানুষ। যার ফলে তারা আজ ইসলাম ও সন্ত্রাসকে একই সরলরেখায় নিয়ে এসেছে এবং দু'টোকে পরস্পরের সমর্থক হিসাবে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করে চলছে।

মিডিয়ার অব্যাহত তথ্য সন্ত্রাসের ফলে ভিন্নধর্মালম্বীরা ছাড়া খোদ কিছু মুসলমানের মধ্যে এ সংশয় দেখা দিয়েছে যে, আসলে কি ইসলাম সন্ত্রাসী ধর্ম ? মুসলমানরা কি কট্টর,গোঁড়া,জঙ্গী ও সন্ত্রাসীবাদী সম্প্রদায় ? না ইসলাম শান্তির ধর্ম।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তোমরা জেনে শুনে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশিয়ো না, আর সত্যকে গোপন কর না।' (সূরা-২ বাকারা, আয়াত : ৪২)। 'কেন তোমরা জেনে শুনে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশাচ্ছ, আর সত্যকে গোপন করছ?' (সূরা-৩ আলে ইমরান, আয়াত : ৭১)।রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের সূচনা করল; সে তার পাপের অধিকারী হবে এবং ওই কাজের অনুগামীদের পাপের ভাগীদার হবে। (মুসলিম)। সুতরাং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়াতে কোনো অপরাধমূলক বা গর্হিত বিষয় প্রকাশ করার আগে এ বিষয়টি চিন্তা করে অবশ্যই এর থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

উপসংহার

আমাদের মানুষের ব্রেইন প্রোগ্রামের মত। একজন প্রোগ্রামার যেভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করবে সেভাবেই তার প্রোজেক্ট সুন্দরভাবে চলবে। আমাদের নির্ধারিত প্রোজেক্টের গন্তব্য এ আমাদের পৌছাতে হলে যেমন কোন স্তর বাদ দিয়ে যাওয়া যাবে না। ঠিক তেমনিভাবে আমরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনের প্রোগ্রামার। আমাদের জীবনে সফল হওয়ার জন্য আমাদের গন্তব্য জান্নাতে পৌছানোর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এই জীবনের প্রোগ্রামে সব স্তর সুন্দরভাবে পার করার চেস্টা করতে হবে। এরজন্য যেই মেনুয়াল আমাদের সাহায্য করবে তা হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। এই কুরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করে পরিবার, সমাজ প্রতিটা ক্ষেত্রে তা মেনে চলে আমাদের চেস্টা করে যেতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আমাদের রাসূল (সা:) যেমন দিন রাত উম্মতের ফিকির করেছেন আমাদেরকেও তার দেখানো পথে পুরো উম্মতকে নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার চেস্টা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত উম্মাহকে হেদায়েত দান করেন এবং আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই হেদায়েতের জারিয়া বানিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদেরকে দিয়ে পুরো উম্মাহর খেদমত করিয়ে দেন। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুক এবং এই ফিকিরকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আল্লাহুম্মাহ আমিন।

এখানে খুবই সংক্ষেপে সুদ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কিছু প্রচলিত প্রশ্ন এর আঙ্গিকে দাওয়াহ দেয়ার বাস্তব পদ্ধতি তুলে ধরার চেস্টা করা হয়েছে। এই প্রতিটা বিষয়ে ইল্ম অর্জনের জন্য ব্যাপক সময় এবং সরাসরি উস্তাযের তত্ত্বাবধানে থেকে লেগে থাকার কোন বিকল্প নেই। আপনাদের দাওয়াত দিচ্ছি আপনারা ফরজে আইন নিয়ে ইল্ম অর্জন করার চেস্টা করার পাশাপাশি ইল্ম অর্জনের এই ধারাকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুক, আমাদের চেস্টা ও ফিকিরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মাহ আমিন।